কোরআন ও হাদীসের আলোকে নামায

সংকলন ও সম্পাদনায়ঃ মো: সাব্বির আলম

কোরআন ও হাদীসের আলোকে নামায

সংকলন ও সম্পাদনায়: **মো: সাব্বির আলম**

প্রকাশনায়: ইমামিয়্যাহ্ কালচারাল সেন্টার

প্রথম প্রকাশকাল:
২০০৫ ইংরেজী
১৪২৬ হিজরী

দিত্বীয় প্রকাশ
১লা মে ২০০৯ ইংরেজী
জামাঃআউ ১৪৩০ হিজরী
বৈশাখ ১৪১৬ বাংলা

প্রচ্ছদ
মোহাম্মদ সাব্বির আলম

কম্পিউটার কম্পোজ
এস জে মাল্টিমেডিয়া

মূল্য : ৫০.০০ টাকা

AwliyaLink
- For the Seekers of Truth !!!
www.ahlulbaytbanglabooks.wordpress.com
E-mail: awliya1214@gmail.com

Quran O Hadiser Aloke Namaz

Completed by : Mohammed Shabbir Alam
Edited by : Mohammed Shabbir Alam
Published in : 1st May 2009, 1430 Hijri.

All rights reserved by the Imamia Cultural Center. Any unauthorized reproduction or photocopy, recording, translation, electronic, mechanical or in any form without permission in writing from the **Imamia Cultural Center** is strictly prohibited.

For further information, Please Contact
Imamia Cultural Center
e-mail:imamiatwelve@yahoo.com

AwliyaLink, www.ahlulbaytbanglabooks.wordpress.com,
E-mail: awliya1214@gmail.com
★★★★★★★★★★★★★★

ক্রনং	বিষয় সংক্ষেপঃ	পৃষ্ঠা নংঃ
০১।	নামায প্রসঙ্গে কোরআনের আয়াত ও হাদীস।	০৩
০২।	নামাযের ওয়াক্ত প্রসঙ্গে।	০৭
০৩।	যোহর-আসর ও মাগরিব-এশা একত্রে পড়া প্রসঙ্গে।	১৫
০৪।	নামাযে দোআ (কুনুত) পড়া প্রসঙ্গে।	১৯
০৫।	নামাযে তাকবির করা প্রসঙ্গে।	২০
০৬।	নামায হাত ছেড়ে আদায় করা প্রসঙ্গে।	২২
০৭।	নামাযে হাত বাঁধা রাসূলের নাপসন্দ নামায প্রসঙ্গে।	২৫
০৮।	সিজদাগাহ্ ও মাটিতে সিজদা করা প্রসঙ্গে।	২৮
০৯।	দ্বিতীয় সিজদার পর ঠিক ভাবে বসা ও উঠা প্রসঙ্গে।	৩২
১০।	হাত মাটিতে রেখে দাঁড়ানো প্রসঙ্গে।	৩৩
১১।	নামাযে তাশাহুদ ও সালাম পাঠ প্রসঙ্গে।	৩৪
১২।	নামাযে মুখ ফিরানো প্রসঙ্গে।	৩৬
১৩।	অযুর নিয়ম প্রসঙ্গে।	৩৭
১৪।	তাহাজ্জুদ ও বেতর নামায প্রসঙ্গে ।	৪০
১৫।	আযানে আলীয়ূন ওয়ালী উলাহ্ বলা প্রসঙ্গে।	৪১
১৬।	আযানে অতিরিক্ত শব্দ যুক্ত প্রসঙ্গে।	৪৬
১৭।	নামাযের সামনে দিয়ে চলা প্রসঙ্গে।	৪৬
১৮।	হাত মাটিতে বিছানো প্রসঙ্গে।	৪৭
১৯।	তারাবীহ নামায প্রসঙ্গে।	৪৭
২০।	দুরূদ পাঠ করা প্রসঙ্গে।	৫২
২১।	নামাযের রুকু প্রসঙ্গে।	৫৪
২২।	চাশতের নামায প্রসঙ্গে।	৫৮
২৩।	ইমামদের শাফাআত প্রসঙ্গে।	৫৯
২৪।	পাঁচ ওয়াক্তের নামায নির্ধারণ প্রসঙ্গে	৬০
২৫।	কিছু উপদেশ বাণী।	৬২

লেখক প্রকাশিত গ্রন্থাবলীঃ

১) সিরাতাল মুস্তাকিম।
২) ইমামত ও হেদায়াত।
৩) মহররমের শোক প্রকাশ।
৪) সত্যের আহবান ১ম খন্ড - ৫ম খন্ড।
৫) কোরআন ও হাদীসের আলোকে নামায।
৬) কোরআন ও হাদীসের আলোকে মাহে রমজান।
(৭) হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) নূরের সৃষ্টি।
(৮) কোরআনের আলোকে নবী ও রাসূলের জীবন কাহীনী।
(৯) কোরআন ও আহ্‌লেবায়তের দৃষ্টিতে সুস্বাস্থ্য গঠনের আদর্শ।

AwliyaLink, www.ahlulbaytbanglabooks.wordpress.com,
E-mail: awliya1214@gmail.com
★★★★★★★★★★★★★★

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

নামাজ প্রসঙ্গে কোরআনের আয়াত ও হাদীস ।

* সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক ।'
(সূত্রঃ আল কোরআন, সূরা ফাতেহা, আয়াতঃ ১, শুরা নংঃ ১) ।

* প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য ।
(সূত্রঃ আল কোরআন, সূরা সাফফাত, আয়াত- ১৮২) ।

* এবং তাঁহার সমতুল্য কেহই নাই ।
(সুত্রঃ আল কোরআন, সূরা ইখলাস, আয়াত- ৩, শুরা নং- ১১২) ।

* আল্লাহ বলছেনঃ আমি জ্বীন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি । (সূত্রঃ আল কোরআন, সূরা যারিয়াতঃ আয়াতঃ ৫৬) ।

* আল্লাহ বলছেনঃ "ওয়া আক্বীমুস সালাতা ওয়া আতুজ যাকাতা অর্‌কা'উ মা'আর্‌ রাকিঈন্‌ । অর্থাৎ- তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যাহারা রুকূ করে তাহাদের সাথে রুকূ কর ।। (সূত্রঃ আল কোরআন, সূরা বাকারাঃ ৪৩) ।

* আমিই আল্লাহ্‌ আমা ব্যতীত কোন উপাস্য নাই । অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্বরনার্থের জন্য নামায পড় ।" (সূরা তা'হা, আয়াতঃ ১৪) ।

* অবশ্যই সালাত মানুষকে অশ্লীল অনাচার হইতে উদ্ধার করে । (সূত্রঃ আল কোরআন, সূরা আন কাবুত, আয়াতঃ ৪৫) ।

* এবং আল্লাহ বলছেন, "যেকোন বিপদ আরম্ভ হইলে ধৈর্যের সহিত নামায পড়" । (সূত্রঃ আল কোরআন, সূরা বাকারা, আয়াতঃ ৪৫, শুরা নং- ২) ।

* কেহ রাসূলের আনুগত্য করিলে সেতো আল্লাহরই আনুগত্য করিল এবং কেহ মুখ ফিরাইয়া লইলে তোমাকে তাহাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক প্রেরণ করি নাই। (সুত্রঃ আল কোরআন, সূরা নিসা, আয়াত: ৮০, শুরা নং: ৪)।
* সালাত সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বেই পাঠকের অবগতির জন্য একটি কথা সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, পাঞ্জাগানা বা পাঁচওয়াক্ত নামাযে আমরা বিশ্বাস করি এবং আদায় করার চেষ্ঠা করি। উম্মতকে পাঁচওয়াক্ত নামায পড়ার বিধান দেওয়া হয়েছে, এতে কোন মাজহাবের মধ্যে বিরোধ নেই। আরকান আহকাম বা নামায পড়ার পদ্ধতিগত পার্থক্য থাকলেও পাঁচওয়াক্তের ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই।

* ইবাদতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত নামায এবং ইহা সকল ফেরকার সর্ববাদী সম্মত বটে, কিন্তু ঐ নামাযেই প্রত্যেক ফেরকার বিভিন্ন তরিকা পরিদৃষ্ট হয়। এবং সকলেই আবার দাবী করেন যে আমাদের নামায প্রকৃত ইসলামী নামায, কোরআনের নির্দেশানুবর্তী, রাসূলে কারিম (সাঃ)-এর দীক্ষিত নামায। এই রূপে ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের নামায প্রচলন প্রায়। ফেরকা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আগেই ঘোষনা দিয়ে গিয়েছিলেন যে, 'বণী ঈসরাইলরা ৭১ ফেরকায় বিভক্ত হয়ে পরেছিল, নাসারারা ৭২ ফেরকায় আর আমার উম্মাত আমার পর ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত হয়ে যাবে। এর মধ্যে ৭২ ভাগ যাবে দোযখে আর বাকি একটি দলই যাবে বেহেস্তে। (সূত্রঃ সহী মুসলিম ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা: ২৭৫, কোরআনুল করীম (সওদী) পৃষ্ঠা: ৪২৭, সহী তিরমীজি ৫ম খন্ড, হাদীস: ২৬৪২ (ইফাবা), আবু দাউদ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা: ৩১৭ (উর্দ্দু), মুস্ত াদারাক হাকেম, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা: ১০৯, মাসনাদে হাম্বাল, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা: ১৪)।

* নবীর উম্মত হওয়ার পরও আমরা কেন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হব? কারণ শুধু এটাই যে নবীকে মুখে মানবো, ধর্ম পালন করবো মনমতো, কোরআন হাদীস যাদেরকে অনুসরণ করতে বলেছে, আমরা তাদেরকে মানছি না। এ হাদীস অনুসারে নামধারী মুসলমানদের অধিকাংশই জাহান্নামী। তাহলে আমাদের গর্ব করারও কিছু থাকেনা। কারন নিজের মুক্তির নিশ্চয়তা না পেয়ে অপরকে হেয় করার ধৃষ্টতা দেখানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আর যারা চক্ষু, কর্ণ ও কলব (অন্তর) কাজে লাগায় না তাদের লক্ষ্যে আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে বলেছেন- "আমি সৃষ্টি করেছি দোজখের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষকে। তাদের অন্তর (কলব) রয়েছে, কিন্তু তার দ্বারা বিবেচনা করেনা, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে তার দ্বারা শোনে না। তারা

চতুষ্পদ জন্তুর মতো, বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। (সূত্রঃ আল কোরআন:- সুরা আরাফ-আয়াতঃ ১৭৯)।

* তাই প্রত্যেক ফেরকার দাবিতে রাসূলের দেওয়া নামাযটি আজ এত রূপে বিভক্ত হয়ে পরেছে। তাছাড়া ইহার সঠিক পথ জানতে চাইলে বিভিন্ন আলেমগন ফতুয়া দেন যে, যেভাবেই কর যেমনই কর কিন্তু খোদাকে স্মরণ কর। কিন্তু খোদা তাদেরকে বলছেন "হে ঈমানদ্বারগণ আমাকে ভয় কর, এবং আমার কাছে পৌছার উসিল্লা তালাশ কর।" (সুরা মায়েদাঃ আয়াতঃ ৩৫)।

* তাই নামাযের এত প্রকার রূপ ধারনই নামায বাতিল হইবার প্রমান। যাহা খোদার বাণীতে পরিস্কার ভাবে প্রকাশ পায় যে, "ওয়া আমেলাতেন নাসেবাতেন তাস্‌লা নারান হামেয়াতোন" অর্থাৎ- অনেকে এমনো আছে যারা আমল করেন ও উহার জন্য দুঃখ কষ্ট সহ্য করেন কিন্তু তাহাদের সেই আমলই তাহাদের জন্যে দোজখের ইন্ধন হইতে থাকে।" এইরূপ আমল তাদেরকে এক পাঁ দুই পাঁ করিয়া জাহান্নামের সন্নিকটে ঠেলিয়ে দেয়। এবং খোদা বলছেন যে, "আল্লাহর সহিত ইনসানের রূহের (আত্মার) সংযোগ সাধনই নামাযের উদ্দেশ্য, আল্লাহর ধ্যান ও স্মরণই নামাযের প্রাণ, প্রানহীন নামাযে কোন ফায়দা হাসিল (লাভ) হয় না; বরং আল্লাহর অসন্তুষ্টি অর্জন করে।" (সূত্রঃ নেয়ামুল কোরআন, পৃষ্ঠাঃ ২৫৪; মৌলবী মোহাম্মদ শামসুল হুদা-বি.এ.বি.এল)

* খোদা কোরআনে বলছেন, "সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায় কারীদিগের, যাহারা তাহাদিগের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যাহারা লোক দেখানোর জন্য উহা করে।" (সূত্রঃ আল কোরআনঃ সুরা মাউন- আয়াতঃ ৪-৬)

* সুতরাং আমল করার সময় ভালোভাবে লক্ষ্য করা উচিত যে তাহার নামায যেন বাতিল না হয় এবং তাহাকে যেন জাহান্নামের সন্নিকটে করিয়া না দেয়। তাই হাদীসেও উহার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, 'যাহার নামায ভুল ত্রুটির জন্য কবুল হইবার নহে, তাহার নামায তার মুখের উপর ছুরিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়।' তাই যত তরিকাতেই নামায আদায় হইয়া থাকে তার মধ্যে নিশ্চয়ই একটি তরিকা শুদ্ধ হইবে এবং বাকি তরিকার নামায অশুদ্ধ হওয়াতে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। মুসলমানদের এই বিষয়ে শান্ত মনে বিশেষ চিন্তা ও

গবেষনা করা একান্ত প্রয়োজন। কারন মৃত্যু অনিবার্য, একদিন প্রত্যেককেই তাহাদের কার্য কর্মফলের হিসাব দিতে হবে। এই বিভেদ সৃষ্টি ও বিভ্রান্তকর তরিকা প্রচলনের একমাত্র কারণ হল যাহারা খোদা রাসূলের দ্বীনের রক্ষাকারী, তত্ত্বাবধায়ক, সত্যপথ প্রদর্শক, হেদায়েতকারী ও খোদার আহ্কামের ওয়ারিশ 'আহ্লেবায়তে রাসূল (সাঃ)' তাহাদেরকে ছাড়িয়া অন্যের অনুসরণ করাতেই এত বিভেদ সৃষ্টি। কোরআন পাকে তাহাদের পরিচয় পরিস্কার ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং একমাত্র তাহাদেরই অনুসরণের নির্দেশজ্বারী করা হইয়াছে। যেমন পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে যে, "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর অনুগত্য কর, রাসূলের অনুগত্য কর এবং উলিল আমরের (যাহারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দানের ক্ষমতা প্রাপ্ত)। (সূত্রঃ আল কোরআন, সূরা নিসাঃ আয়াতঃ ৫৯)।

* সুতরাং হে লোকেরা জ্ঞানীদেরকে (আহলুয্ যিক্র) জিজ্ঞাসা কর যদি তোমাদের জ্ঞান না থাকে। (সুত্রঃ আল কোরআন, সুরা নাহাল-আয়াতঃ ৪৩)

* আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জ্ঞানী ব্যক্তিরা অর্থাৎ আহলুয্ যিক্র হইলেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), হযরত আলী (আঃ), হযরত ফাতেমা (আঃ), হযরত হাসান (আঃ) ও হযরত হোসাইন (আঃ) এবং তাহারাই হইলেন আহ্লুয্ যিকর অর্থাৎ জ্ঞান বুদ্ধি আর ব্যাখ্যার ভান্ডার, তাহারাই হইলেন নবুয়্যতের পরিবার, রেসালতের খনি এবং ফেরেশতাদের অবতরণের স্থান। যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ বলিয়াছেন যে, যখন এই আয়াত নাযিল হইল তখন হযরত আলী (আঃ) ফরমাইলেনঃ আমরাই হইলাম জ্ঞানের ভান্ডার। ওয়াকী বিন যারাহ এবং সুফিয়ান সওরী এই বর্ণনাটি নকল করিয়াছেন। (সূত্রঃ কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৫৬; ইয়ানাবিউল মাওয়াদ্দাহ্, পৃষ্ঠাঃ ৪৬; কেফাইয়াতুল মোওয়াহ্হেদীন, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৬৫০; রওয়ানে জাভেদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ২৮৮; মাজমাউল বয়ান, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩৬২; আল মুরাযেয়াত, পৃষ্ঠাঃ ৫৫; বয়ানুস্ সায়াদাহ্ , ২য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৪১৩; আর্‌রিয়াজুন নাজরা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ২০৯; মাজমাউজ যাওয়ায়েদ, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১১৬; তাফসীরে তাবারী, ১৪তম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১০৮)।

* নামাযে প্রত্যেক ফেরকার বিভিন্ন তরিকা পরিদৃষ্ট হয় যেমন, কেহ বুকে হাত বাঁধেন, কেহ পেটের উপর, কেহ নাভির নিচে তল পেটে হাত বাঁধেন, আবার কেহ বা হাত ছাড়িয়াই নামায পড়েন এবং দেখা যাচ্ছে যাহারা হাত বাঁধেন তাহাদের আবার হাত বাঁধিবার তরিকাও বিভিন্ন রূপি। আবার কেহ বিসমিল্লাহ ছাড়াই সূরা পড়েন, কেহ আমিন বলেন, আর কেহ রেফায়েয়্যাদান করেন। অথচ আমরা রাসূলের উম্মাত, আমাদের অবশ্যই উচিত রাসূলের উপদেশ মত নামাযকে আদায় করা এবং স্বাভাবিক ভাবে রাসূল যেভাবে নামায পড়তেন সেভাবেই পড়া। তাই রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে বলেগেছেন যে, "তোমরা যাহা না বুঝ উহা আহলে যিক্র হইতে বুঝিয়া লও" (সুরা নাহাল: ৪৩)। এখানে আহলে যিক্র বলতে রাসূলের আহলেবায়তকে বুঝায়। কারন ঘরের মালিকই ঘর সম্বন্ধে অধিক জ্ঞান থাকে। তাই আহলেবায়েত হচ্ছেন রাসূলের ঘরের লোক। তারাই হচ্ছেন রাসূল (সাঃ)-এর বংশধর তারাই একমাত্র সঠিক পথের অনুসারী। আর সঠিক নামায হচ্ছে একটি ধাপ আর গ্রহণযোগ্য নামায হচ্ছে আরেকটি উচ্চতর ধাপ। আপনি হয়তোবা খুব ভালো মতো পড়াশোনা করতে পারেন। কিন্তু বার্ষিক পরীক্ষায় পাস করা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মানুষ হয়তো সব সময় তার নামায ও ইবাদতসমূহকে সম্পাদন করে থাকে। অথচ তার নামাযের মধ্যকার ভুল-ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার কারণে আল্লাহর দরবারে তা গ্রহনীয় নাও হতে পারে। কারন একজন ছাত্র হয়তো খুব ভালো নম্বর পায়। কিন্তু তার আচরণ ও চাল-চলন শিক্ষকের কাছে পছন্দনীয় নাও হতে পারে। অতএব নামাযের মাপকাঠি হলো তা কবুল হওয়া। কাজেই চেষ্ঠা করতে হবে আল্লাহর দরবারে তাঁরাই পছন্দনীয় নামাযকে উপস্থাপন করার জন্য। ইমাম আলী (আঃ) বলেনঃ "আমল সম্পাদন করার চেয়ে তা কবুল হওয়ার দিকে বেশি মনোযোগী হও। (সূত্রঃ বিহারুল আনোয়ার, খন্ড ৭১, পৃষ্ঠা: ১৭৩)।

নামাযের ওয়াক্ত প্রসঙ্গে

* নিশ্চয়ই মু'মিনদের জন্যে নামায লিখে (ফরয করে) দেয়া হয়েছে, সময় ও নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। (সূত্রঃ আল কোরআন, সূরা আন্‌নিসা, আয়াত: ১০৩, শুরা নং: ৪)।

* নামাযের সময় প্রসঙ্গে কোরআনের আয়াত, নামাযকে ৩ টি সময়ে আদায় করিতে হবে যেমন, "তুমি সালাত কায়েম করিবে দিবসের দুই প্রান্তভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে।" (সূত্রঃ আল কোরআন, সূরা হুদ, আয়াতঃ ১১৪)।
* দিবসের প্রথম প্রান্তভাগে ফজরের সালাত, দ্বিতীয় প্রান্তভাগে যোহর ও আসরের সালাত, এবং রাত্রির প্রথমাংশেই মাগরিব ও এশার সালাত। মোট এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ। (সূত্রঃ আল কোরআনুল করীম, সূরা হুদ, আয়াতঃ ১১৪, পারাঃ ১২, পৃষ্ঠাঃ ৩৫৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অনুদিত, অক্টোবর ১৯৯০, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০)।

* এবং তোমরা দিনের দু'ভাগে ও রাত্রের প্রথমাংশে নামায কায়েম কর। নিশ্চয় নেক কাজসমূহ বদ আমলসমূহকে দূর করে। স্মরণকারীদের জন্য এটা উপদেশবাণী। আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় নির্দেশ করা হয়েছে। দিনের দু'ভাগের প্রথম ভাগে হলো ফজরের নামায, দ্বিতীয়ভাগে যোহর ও আসরের নামায এবং রাত্রের প্রথমাংশে হলে মাগরিব ও এশার নামায। (সূত্রঃ আল কোরআন ও সহীহ আল বুখারী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৪২৯ (অনুচ্ছেদ)।

* "আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্যই কর্তব্য।" (সূত্রঃ সূরা নেসা, আয়াতঃ ১০৩, শুরা নংঃ ৪)।

* নামাযের ওয়াক্ত এবং আরকান আহকামগুলোর নির্দেশ আমরা পেয়েছি হাদীস শরীফ থেকে। পবিত্র কোরআন শরীফে পাঁচ ওয়াক্ত এবং কিভাবে নামায পড়তে হবে তার উল্লেখ নেই। পবিত্র কোরআনে যেখানে 'আকিমুস সালাতা' আছে সেখানে তরজমায় 'নামায পড়' বলে অনুবাদ করা হয়েছে। বস্তুতঃ নামায পড়া এবং সালাত কায়েম করার মধ্যে বিস্তর তফাৎ রয়েছে। পবিত্র কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াতশরীফ গুলোতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ওয়াক্ত' উল্লেখ আছে বলে বিভিন্ন আলেম ওলেমাগন যে কথা বলে থাকেন সেগুলো আমরা এখন পর্যালোচনা করব।

* 'আকিমুস সালাতা লি দুলুকিশ শামসি ইলা গাসাকিল লাইলি ওয়া কুরআনাল ফাজ্বরি ইন্না কুরআনাল ফাজ্বরি কানা মাশহুদ' অর্থঃ (হে নবী) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত (সময়ের ভেতর) নামায প্রতিষ্ঠা করবে এবং ফজরের সময় কোরআন তেলাওয়াত (জারি রাখবে); অবশ্য

ফজরের কোরআন তেলাওয়াত (সহজেই) পরিলক্ষিত হয়। (সূত্রঃ আল কোরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াতঃ ৭৮; আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, পৃষ্ঠাঃ ৩৪৯)।

* 'ফাসবির আলা মা ইয়াকুলুনা ওয়া সাব্বিহ্‌ বিহামদি রাব্বিকা কাব্‌লা তুলুয়িশ শামসি ওয়া কাব্‌লা গুরুবিহা ওয়া মিন আনায়িল লাইলি ফাসাব্বিহ ওয়া আতরাফান নাহারি' অর্থঃ সুতরাং উহারা যাহা বলে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, এবং দিবসের প্রান্তসমূহেও যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইতে পার। (এই আয়াতের তাফসিরে বলা হয়েছে সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজর, সূর্যাস্তের পূর্বে আসর, রাত্রিকালে মাগরিব ও ইশা এবং দিবসের প্রান্তে অর্থাৎ সূর্য পশ্চিমে হেলিয়া যাওয়ার পরে জুহ্‌র এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বিবরণ এখানে দেওয়া হয়েছে)। (সূত্রঃ সুরা ত্বাহা, আয়াতঃ ১৩০, শুরা নংঃ ২০; আল-কুরআনুল করীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩৭তম মুদ্রণ (রাজস্ব প্রথম) জুন-২০০৮, ৪র্থ মুদ্রণ অক্টোবর ১৯৯০, পৃষ্ঠাঃ ৫০৯)।

* উপরিবর্ণিত আয়াতের আরেক তরজমায় ও তার অনুবাদক অধ্যাপক গোলাম আযম তার অনুবাদে লিখেছেন যে, সূর্য ওঠার আগে ফজরের নামায, সূর্য ডোবার আগে আসরের নামায এবং রাতে **ইশা ও তাহাজ্জুদের** নামায। আর দিনের কিনারা বলতে দিনের তিনটি কিনারাই হতে পারে- একটি হলো খুব সকাল, দ্বিতীয়টি হলো দুপুর আর তৃতীয়টি হচ্ছে সন্ধ্যা। সুতরাং দিনের কিনারাগুলো বলতে ফজর, যোহর ও মাগরিবের নামাযই বোঝানো হয়েছে। (সূত্রঃ সহজ বাংলায় আল কুরআনের অনুবাদ, দ্বিতীয় খন্ড, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)-এর উর্দূ তরজমার বাংলা অনুবাদ, অধ্যাপক গোলাম আযম, সূরা ত্বাহা, আয়াতঃ ১৩০; পৃষ্ঠাঃ ১৬০)।

* 'ফা সুবহানাল্লিহি হীনা তুমসুনা ওয়া হীনা তুসবিহুন ওয়া লাহুল হামদু ফীস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া আশিয়্যাঁও ওয়া হীনা তুজহিরুন' অর্থঃ আল্লাহর তসবীহ্‌ পাঠ কর যখন তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হও এবং যখন তোমরা সকাল কর। তাঁহারই প্রশংসা আসমান সমূহে এবং জমীনে এবং বৈকালে আর যখন তোমরা দ্বিপ্রহরে পৌছ। (সূত্রঃ আল কোরআন, সূরা রূম, আয়াতঃ ১৭-১৮)।

* সালাতে যত্নবান হও বিশেষত: মধ্যবর্তী নামাযে আল্লাহর সম্মুখে বিনীতভাবে দাঁড়াও। (সূরা বাকারা, আয়াত: ২৩৮)।

* সুরা বনি ইস্রাইলের ৭৮ নং আয়াতটি সম্পর্কে তফসিরে বলা হয়, উক্ত আয়াতে নাকি পাঁচ ওয়াক্ত আল্লাহপাক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। 'দুলুকি' শব্দের অর্থ ঢলে পড়া ও অস্ত যাওয়া। এখানে ঢলে পড়া অর্থটিই নেওয়া হয়েছে। 'ইলা গাসাকিল লাইলি' অর্থ হচ্ছে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত। সূর্য ঢলে পড়া হতে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত এ বাক্যের মধ্যে জোহর, আসর, মাগরিব ও এশা ওয়াক্তের কথা বলেছেন বলে তফসীরকারকরা দাবী করেন। 'কুরআনাল ফাজরি' শব্দের দারা 'ফজরের' নামাযের ওয়াক্তকে ধরে নিয়েছেন। 'দুলকি' শব্দের অর্থ যদিও 'সূর্য ঢলে পড়া' (প্রকৃত অর্থ অস্ত যাওয়া) ধরে নেওয়া যায় এবং রাত্রির অন্ধকার হয়ে যাওয়া পর্যন্ত যদি আল্লাহ নামায পড়ার নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তাহলে তা হবে অবিরাম বা চলমান একটি নির্দেশ। এখানে মাঝখানে বিরত হবার কোন অবকাশ নেই। তাছাড়া জোহর, আসর, মাগরিব, এশা এ সমস্ত শব্দগুলো আল্লাহপাকের অজানা থাকার কথা নয়। তিনি এ শব্দগুলো ব্যবহার করলেন না কেন? অথচ সুরা নূরের ৫৮নং আয়াতে 'সালাতুল ফাজ্বরি' ও সালাতুল এশা' ওয়াক্ত উল্লেখ করেছেন। সুরা বানি ইস্রাইলের আয়াতে আল্লাহপাক জোহর, আসর, মাগরিব, এশা ওয়াক্তগুলো উল্লেখ না করার কারণ কি? আর আমাদের তফসীরকারকরাও এখানে আল্লাহপাক যা উল্লেখ করেননি তা বন্ধনীর মাধ্যমে অথবা তরজমায় কিভাবে বসিয়ে দিলেন? 'পাঁচ ওয়াক্ত পবিত্র কোরআনে নির্ধারিত আছে' এ কথা প্রমাণ করার জন্য এ কি তাদের মনগড়া ব্যাখ্যা নয়? দ্বিতীয়তঃ 'কুরআনাল ফজরি' কে ফজরের নামায বললেন কি ভাবে? 'কুরআন' শব্দের অর্থ হল পাঠ। সুতরাং 'কুরআনাল ফাজরি' অর্থ সকালের পঠন বা পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত হতে পারে।

* সুরা ত্বাহার ১৩০ নং আয়াতে আমরা লক্ষ করেছি যে, আল- কুরআনুল করীম ইসলামিক ফাউন্ডেশনের যে কিতাব রয়েছ সেখানে তাফসিরে সব ওয়াক্তের নামাযকে পৃথক ভাবে দেখিয়ে মাগরিব ও ইশার নামাযকে আবার একত্রে কেন বলা হয়েছে? এই দুই ওয়াক্তের নামাযের বেলায় পৃথক সময় এখানে আসেনি কেন? আর এই পুস্তকের অনুবাদকগন এখানে মাগরিব ও ইশা নামাযের কথা বলেছেন। তাহলে এখানে অবশ্যই মাগরিব ও ইশার নামাযকে একত্রে পড়ার

নির্দেশ রয়েছে। আর একই আয়াতের অনুবাদে অন্যান্য অনুবাদকগন আবার ইশার সাথে অন্য নামাযের কথা বলেছেন।

* উপরিবর্ণিত আয়াতটি আবুল আ'লা মওদূদীর তরজমার কিতাবে আবার উল্লেখ আছে যে, 'সূর্য ওঠার আগে ফজরের নামায, সূর্য ডোবার আগে আসরের নামায এবং রাতে **ইশা ও তাহাজ্জুদের** নামায'। এখানে আবার ইশা ও তাহাজ্জুদের নামায বলা হয়েছে মাগরিব গেল কোথায়? এখানে মাগরিবের নামাযের ওয়াক্তকে তো তার অনুবাদে তিনি কিনারায় ঠেলে দিয়েছেন।

* 'সুতরাং যখন তোমাদের সন্ধা হয় এবং যখন তোমাদের সকাল হয় তখন তোমরা আল্লাহর তাসবীহ কর। আসমান ও জমিনে সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। (তোমরা) সন্ধ্যায় ও যখন তোমাদের কাছে যোহরের সময় এসে যায় তখন (তার তাসবীহ কর)। (সূত্রঃ আল কোরআন সূরা রূম, আয়াতঃ ১৭-১৮, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)-এর আল কোরআনের অনুবাদ অধ্যাপক গোলাম আযম, পৃষ্ঠাঃ ৩৩৫, দ্বিতীয় খন্ড)।

* এখানে নামাযের চার ওয়াক্তের প্রতি ইশারা বুঝানো হয়েছে- ফজর, মাগরিব, আসর ও যোহর। ও কোরআনের অন্যান্য আয়াত থেকে বাকি একটি নামাযের ওয়াক্ত কে নিতে বলা হয়েছে। (সূত্রঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)-এর আল কোরআনের অনুবাদ অধ্যাপক গোলাম আযম, পৃষ্ঠাঃ ৩৩৫, দ্বিতীয় খন্ড)।

* তাছারা সূরা রূমের ১৭ ও ১৮ নম্বর আয়াতে যেখানে, ফাসুবহা-নাল্লাহি হীনা তুমসুনা অহীনা তুসবিহুন অর্থাৎ আল্লাহর তাসবিহ পাঠ কর যখন তোমরা সকাল সন্ধায় উপনীত হও, এখানে 'তসবিহ পাঠ কর' কে নামায পড় অনুবাদ করা হয়েছে। নামায ছাড়াও অনেক উপায়ে তসবিহ পাঠ করা যায়।

* সাত আসমান, যমীন এবং এ (দু'য়ের) মাঝখানে যা কিছু (মজুদ) আছে তা সবই আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে; (সৃষ্টিলোকে) কোনো একটি জিনিসই এমন নেই যা তাঁর প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহাত্ম্য ঘোষণা করে না; কিন্তু তাদের এ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন

করতে পারো না; অবশ্যই তিনি একান্ত সহনশীল ও ক্ষমাপরায়ণ। (সূত্রঃ আল কোরআন, সুরাঃ বণী ইসরাঈল, আয়াতঃ ৪৪, শুরা নংঃ ১৭)।

* সুতরাং প্রশংসা গীত বা তসবিহ পাঠ করা আর নামায পড়া এক কথা নয়। 'আকীমুস সালাতা' সালাত কায়েম করার কথা পূর্ববর্তী নবীদেরও বলা হয়েছে। যেমন মূসা (আঃ)কে বলা হয়েছে 'আকীমুস সালাতা লে জিকরী' আমার স্মরণের জন্য সালাত কায়েম কর। (সূরা ত্বাহা, আয়াতঃ ১৪, শুরা নংঃ ২০)।

* সুরা ইব্রাহিমে সালাত কায়েমের কথা উল্লেখ আছে। যেমনঃ হে আমার মালিক, তুমি আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানাও, আমার সন্তানদের মাঝ থেকেও (নামাযী বান্দা বানাও), হে আমাদের মালিক, আমার দোয়া তুমি কুবুল করো। (সুত্রঃ আল কোরআন, সূরাঃ ইবরাহীম, আয়াতঃ ৩৭ ও ৪০, শুরা নংঃ ১৪)।

* অর্থাৎ অন্যান্য নবীগনকেও এ হুকুম দেয়া হয়েছিল। ইসলামী শরিয়াতে নামাযের ওয়াক্ত ও আরকান আহকামগুলো মেহরাজের পর প্রিয়নবী (সাঃ) প্রয়োগ করেছেন। তার আগে পাঁচ ওয়াক্তও ছিলো না, তার গঠন প্রকৃতিও ছিলনা। কিন্তু আকিমুস সালাত এর নির্দেশ মেহরাজের আগেও যেমন ছিল, পূর্ববর্তী নবীদের আমলেও ছিল অর্থাৎ মেহরাজের পর প্রিয়নবী (সাঃ) এর নির্দেশে উম্মত যেভাবে নামায পড়ার আরকান আহকামগুলো মেনে চলছে, পূর্বে সেভাবে সালাত করা হত না। বিভিন্ন নবী (আঃ)দের বেলায়ও বিভিন্নভাবে সালাত কায়েমের ব্যবস্থা ছিল। সালাত কায়েমের কথাটি সর্বকালিন, কিন্তু কিভাবে আদায় করতে হবে তা হচ্ছে আপেক্ষিক। সালাত কায়েম করতেই হবে, এ ছাড়া মানবজাতির মুক্তি নেই, কিন্তু তার পদ্ধতি ছিল যুগে যুগে ভিন্ন। বা এ কথাও বলা চলে যে, শুধু মাত্র একটি ভঙ্গি বা পদ্ধতির মাধ্যমেই সালাত কায়েম করতে হবে এবং অন্য কোন পদ্ধতিতে সালাত আদায় বা কায়েম করা যাবে না বা হারাম এ কথা বলার অধিকার কেউ রাখে না। 'আকীমুস সালাত' অর্থ নামায কায়েম কর। এ কথা ঠিক যে, কায়েম করার জন্য পড়ার বা অনুষ্ঠান অনুশীলনের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলে পড়া আর কায়েম করা এক কথা নয়। 'কায়েম' অর্থ আমরা বুঝি কোন কিছু

বিরতিহীনভাবে চালু বা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া। এ কায়েমের মধ্যে কোন বিরত থাকতে পারে না। 'কায়েম' কোন নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। ইহা 'চির-চলমান বা স্থায়ী একটি ব্যাপার। 'আকিমুস সালাত' শব্দ দ্বারা যদি আল্লাহপাক শুধু নামায পড়া বুঝাতেন, তাহলে তিনি ঐ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করতেন। আল্লাহতালা বলেছেন তিনি সোজা সহজ ও সরল ভাষায় পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করেছেন যাতে মানুষ বুঝতে পারে। 'আকীমুস সালাত' অর্থ যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়াকে বুঝানো হয় তাহলে 'ওয়াল্লাজিনা হুম আলা সালাতিহিম দায়েমুন' অর্থাৎ যারা সদা সর্বদা সালাতের উপর আছে, এ কথার অর্থ কি? জবরদস্তী তো এ আয়াতকে আর পাঁচ ওয়াক্তের ছাচে ফেলানো যাবে না? সালাত কায়েম হয়ে গেলে আর আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হয় না। তখন মুমিনের প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাসই সালাতে পরিণত হয়। ইহা অবশ্য আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে অতি উচ্চ মকাম প্রাপ্তির মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে থাকে। এই মকামকে 'আবদুহুর' মকাম বলে। যেমন অনেক উচ্চস্তরের অলিআল্লাহ কামালিয়াত অর্জনের পর আর আনুষ্ঠানিক এবাদত করতে দেখা যায় না। ফলে অজ্ঞ লোকেরা তাঁদের নামায, রোযা বিহীন মনে করে নানা রকম সমালোচনা করতে দেখা যায়। তফসীরে ইবনুল আরাবীতে উল্লেখ আছে- 'খোদাতালার প্রেমাগ্নীকে জাগ্রত করার নামই হচ্ছে সালাত। যেহেতু 'সলয়ুন' ধাতু হতে সালাত, যার অর্থ ধামাচাপা পড়া আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করা। (সূত্রঃ আহলে কোরআন, সৈয়দ গোলাম মোরশেদ, পৃষ্ঠাঃ ৫৩)

* পবিত্র কোরআনের আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে- 'আর সকাল বিকাল তোমার রবের যিকির কর। রাত্রে তাঁর প্রতি সিজদাবনত থাক এবং রাত্রের দীর্ঘ সময় তাসবিহ্ পড়। (সূরা দাহর, আয়াতঃ ২৫-২৬, শুরা নংঃ ৭৬)।

* পবিত্র এ আয়াতদ্বয়ের তফসির করতে গিয়ে মুফাচ্ছিররা বলেন, সকালের যিকির দ্বারা ফজরের নামায, বিকালের যিকির দ্বারা যোহর ও আসরের নামায, 'রাত্রে তাঁর প্রতি সিজদাবনত থাক' কথার দ্বারা মাগরিব ও ইশার নামাযের কথা বুঝানো হয়েছে এবং তাহাজ্জুদের নামাযের নির্দেশও এর মধ্যে এসে যায়। (সূত্রঃ আল কুরআনের অনুবাদ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)- এর উর্দূ তরজমার বাংলা অনুবাদ অধ্যাপক গোলাম আযম, ৩য় খন্ড, সূরা

দাহরঃ ২৫-২৬, পৃঃ ৩৩২; কানজুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান, বাংলা অনুবাদ, আহমদ রেযা খান বেরলভী ও নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী, পৃষ্ঠাঃ ১০৪৮)।

* সুরা দাহরের 'সাবিহ্হু লাইলান তাবীলা' এই আয়াত ' দ্বারা কি সারারাত নামায পড়ার হুকুম বুঝাবে? অনেকে সাবিহ্হুকে নামায পড়ার হুকুম বলে চালিয়ে দিয়েছেন। সূরা দাহরের ২৫ এবং ২৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভ্রান্তি কর কথাবার্তা বলে এই আয়াত দু'টির দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত ও তাহাজ্জুদের নামাযের আদেশ বলে চালিয়ে দেন, তাতে তাহাজ্জুদ নামাযও ফরজ হয়ে যায়। একবার বলেন সুরা মুজাম্মিল নাজিল হবার পূর্বে তাহাজ্জুদ উম্মতের জন্য ফরজ ছিল। পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারিত হবার পর তাহাজ্জুদের ফরজিয়াত রহিত হয়। আবার সুরা দাহর (যা মাদানী সুরা এবং শেষের দিকের সুরা) এর ২৫ এবং ২৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিজেদের অজান্তেই তাহাজ্জুদকে ফরজ ঘোষনা করে দিচ্ছেন।

* এখন কথা হচ্ছে- তফসিরকারকদের ভাষ্যানুযায়ী সুরা বনী ইসরাঈলের ৭৮ নং আয়াতে আল্লাহপাক পাঁচওয়াক্ত নির্ধারণ করে দিয়ে নামায পড়ার নির্দেশ জারি করেন এবং মুয্যাম্মিলের ২০ নং আয়াতে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁদের কথামত এ দুটি সুরার উল্লেখিত আয়াতগুলোর মধ্যে পাঁচওয়াক্ত ও তাহাজ্জুদের নামাযের নির্দেশ এসে গেছে। আমরা জানি যে, এ দুটি সুরাই মক্কী সুরা। অর্থাৎ মক্কী সুরাতেই পাঁচওয়াক্ত ও তাহাজ্জুদ নামাযের নির্দেশ এসে গেছে এবং সে মোতাবেক প্রিয়নবী (সাঃ) এবং তাঁর উম্মতরা তা নিয়মিত আদায় করে আসছিলেন। তাহলে সুরা দাহরের ২৫ এবং ২৬ নং আয়াতে তারা যে পাঁচ ওয়াক্ত ও তাহাজ্জুদের নির্দেশ দেখতে পাচ্ছেন, সে পাঁচ ওয়াক্ত ও তাহাজ্জুদ কোনগুলো? সুরা দাহর মাদানী জীবনের শেষের দিকের সুরা। সেই মক্কা জীবন থেকেই তো প্রিয় নবী (সাঃ) এবং তাঁর উম্মতরা পাঁচওয়াক্ত ও তাহাজ্জুদ পড়ে আসছেন, তাহলে শেষ বয়সে তাঁকে এ কোন পাঁচওয়াক্ত ও তাহাজ্জুদ পড়ার নির্দেশ দিচ্ছেন? উদাহরণস্বরুপ যেমন শিক্ষক ছাত্রকে নির্দেশ দিলেন, 'পড়'। ছাত্র শিক্ষকের নির্দেশমত পড়ায়রত। শিক্ষক দেখছেন এবং শুনছেন যে, তাঁর নির্দেশ মোতাবেক ছাত্র পড়ছে। তারপরও কি শিক্ষক ছাত্রকে বলবেন, 'পড়' 'পড়'? এ কোন ধরণের কথা!

সুরা দাহরের আয়াতদ্বয়ের দ্বারা যদি পাঁচওয়াক্ত নামায ফরজ হয় তাহলে তো একই আয়াতের দ্বারা তাহাজ্জুদ নামাযও ফরজ হয়ে যায়। ইউসাব্বিহু, তুসাব্বিহু, সাব্বিহু শব্দ গুলোর দ্বারা নামায পড়া যদি হয়ে থাকে তাহলে 'আসমান জমিনের যাবতীয় কিছু আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করে' এ কথার দ্বারা কোন্ পাঞ্জাগানা নামাযের কথা বুঝাবেন?

* পবিত্র আল কোরআনে বলা হয়েছে 'আপনি কি দেখেন না আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, এবং উড়ন্ত পাখী সকল আল্লাহর তসবীহ পড়ছে- প্রত্যেকেই নিজ নিজ তসবীহ সম্পর্কে অবগত আছে এবং তারা যা করে তা সম্পর্কে আল্লাহ অবগত আছেন। (সূত্রঃ আল কোরআন, সূরা নূর, আয়াতঃ ৪১)।

* বজ্রধ্বনি তাঁর (আল্লাহর) প্রশংসায় তসবীহ পড়ে। (সূরা রাদ, আযাতঃ ১৩)।

* এ সমস্ত আয়াতে আল্লাহপাক যখন একটিবারও 'আকিমুস সালাত' শব্দটি ব্যবহার করেননি তাহলে কিসের গরজে আরবী বিদ্বানরা 'ইউসাব্বিহ' 'তুসাব্বিহু' 'সাব্বিহু' শব্দগুলো দ্বারা 'নামাযপড়' বুঝতে গেলেন?

যোহর-আসর ও মাগরিব-এশার নামায একত্রে পড়া

* আমরা বিশ্বাস করি ঃ যোহর ও আসরের নামায এবং মাগরিব ও এশার নামায একসাথে একই ওয়াক্তে পড়ার ব্যাপারে কোন বাঁধা নেই (যদিও প্রত্যেক নামাযই আলাদা ও পৃথক পৃথকভাবে পড়াকে উত্তম ও ফজিলতের কাজ বলে জানি)। আর বিশ্বাস করি যে, লোকদের কষ্টের অবস্থার প্রতি বিবেচনা করে দু'নামাযকে এক সাথে আদায় করার ব্যাপারে রাসূল আকরাম (সাঃ) অনুমতি দিয়েছেন।

* সহীহ তিরমিযিতে ইবনে আনাস (রাঃ) থেকে এভাবে বর্ণিত আছে যে, 'হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) মদীনাতে যোহর ও আসরের নামাযকে এবং মাগরিব ও এশার নামাযকে এক সাথে পড়েছেন, অথচ তখন না কোন ভয়ের কারণ

ছিল আর না বৃষ্টি। লোকেরা ইবনে আনাসকে জিজ্ঞেস করলেনঃ এ কাজের দ্বারা রাসূলে আকরাম (সাঃ) এর উদ্দেশ্য কি ছিল? তিনি বললেন ঃ এ জন্যে যে, তিনি চাইলেন তাঁর উম্মতকে কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করবেন না।' (অর্থাৎ যে সব ক্ষেত্রে পৃথক করলে লোকদের কষ্ট হবে সে ক্ষেত্রে এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে)। (সূত্রঃ সুনানে তিরমিযি ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩৫৪, অধ্যায় ১৩৮; সুনানে বায়হাকী ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৬৭; ইমামিয়্যাহ্ শীয়াদের আকিদা-বিশ্বাস, পৃঃ ৯৫)।

* প্রত্যেক মুসলমানের জন্যেই আবশ্যক হলো পাঁচবার নামায আদায় করা। যেগুলোর শরীয়তসম্মত সময়সীমা কোরআন ও সুন্নতে বর্ণনা করা হয়েছে। মধ্যাহ্ন বা দুপুর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যোহর ও আসরের ওয়াক্ত। মাগরিব (অর্থাৎ সূর্যাস্ত যাওয়ার পর) থেকে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত মাগরিব ও এশার নামাযের সময়। আর ভোরের আলো দেখা থেকে শুরু করে সূর্যোদয় পর্যন্ত ফজরের নামায। আমরা বিশ্বাস করি যে, দুপুর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দু'নামাযের (অর্থাৎ যোহর ও আসর) যৌথ সময়। তবে যোহরের শুরু থেকে চার রাকআত নামায আদায় করা পর্যন্ত যোহরের জন্যে নির্ধারিত ওয়াক্ত (অর্থাৎ এ সময় আসরের নামায হবে না) আবার (সূর্যাস্তের পূর্বে) শেষের দিকে চার রাকআত নামায আদায় করার পরিমাণ সময় হলো আসরের জন্যে নির্ধারিত ওয়াক্ত (অর্থাৎ ঐ সময় যোহরের নামায হবে না)। এ দু'টি বিশেষ সময় ব্যতীত এ দু'ওয়াক্তের মধ্যবর্তী উল্লেখিত সময়ে যখন ইচ্ছা যোহর ও আসরের নামায আদায় করতে পারবে, যদি সে ফযিলত ওয়াক্তকে বিবেচনা না করে। তবে উত্তম হলো এ দু'টি নামাযকে পৃথকভাবে তাদের নির্দিস্ট ফযিলত ওয়াক্তে আদায় করা। যোহরের ফযিলত ওয়াক্ত হলো সূর্য পশ্চিমে হেলে যাওয়ার পর লম্বভাবে দন্ডায়মান কোনো কাঠির ছাঁয়া এর দৈর্ঘ্যের সমপরিমাণ থাকে। আবার আসরের ফযিলত ওয়াক্ত হলো কাঠির ছায়া এর দিগুণ হওয়া পর্যন্ত। স্বয়ং মহানবী (সাঃ)ও অধিকাংশ সময়ই কোনো প্রকার সমস্যা (যেমনঃ সফর, অসুস্থতা ইতাদি) ব্যতীতই দু'নামায একত্রে আদায় করেছেন যাতে উম্মতের জন্যে দায়িত্ব পালন সহজ হয় এবং যে কেউ দু'টি নামায পরপর আদায় করতে চাইবে করতে পারে, আবার যে কেউ চাইবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পড়তে তা-ও পারে। (সূত্রঃ ইমামিয়া বিশ্বাসের সনদ, ১৪৪তম মূলনীতি. পৃষ্ঠাঃ ২২৬)।

* এখানে দু'নামায একত্রে আদায় করা ও এর দলিলসমূহ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। আগ্রহী পাঠকবর্গ এতে আরো দেখতে পারেন।
* মহানবী (সাঃ) যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করেছেন কোনো প্রকার শত্রুর ভয় বা ভ্রমণ ব্যতীতই। (সূত্রঃ মুসলিম শরীফ; ওয়াসায়েলুশ শিয়া খঃ ৩ মাওয়াকিত অধ্যায় বাব-৪ রেওয়ায়েত-১)

* রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যোহর ও আসরের নামায আট রাকাত ও মাগরিব ও এশার নামায সাত রাকাত একসাথে আদায় করতেন। (সূত্রঃ সহীহ্ আল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ২৫৯, ২৫৩, হাদীসঃ ৫১০, ৫১৬, ৫২৯, ৫৩২, ৫৩৬)।

* রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন ভয়-ভীতি, সফর ও বৃষ্টি জনিত কারন ছাড়াই যোহর ও আসরের নামায একসাথে ও মাগরিব ও এশার নামায একসাথ আদায় করেছেন। (সূত্রঃ মুসলিম শরীফ, ৩য় খন্ড, হাদীসঃ ১৪৮৯, ১৪৯৯, ১৫০৩, পৃষ্ঠাঃ ২৪। মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৫৯, রেওয়ায়তঃ ৪০৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; আবু দাউদ ও তিরমিজি)।

* আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেনঃ আমরা আসর পড়িতাম। অতপর গমনকারী কুবার দিকে গমন করিতেন এবং তাঁহাদের (কুবাবাসীদের) নিকট আসিয়া পৌছিতেন (এমন সময় যে), **সূর্য তখনও উঁচুতে**। (সূত্রঃ মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র), ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৫৪, রেওয়ায়তঃ ১০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)।

* আবুর রাবী যাহরাণী (রাঃ) আবদুল্লাহ্ ইবনে শাকীক (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন ইবনে আব্বাস (রাঃ) আসরের পরে আমাদের খুতবা দেন এমন কি সূর্য ডুবে গেল এবং তারকাসমূহ প্রকাশ পেল লোকেরা বলতে লাগল, আস্ সালাত, আস্ সালাত বণী তামিমের এক ব্যক্তি তাঁর দিকে এগিয়ে এসে অন্য দিকে না তাকিয়ে অবিরাম বলতে লাগল, আস্ সালাত, আস্ সালাত। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন তোমার সর্বনাশ হোক, তুমি আমাকে সুন্নতের শিক্ষা দিচ্ছ? তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহকে দেখেছি যে, তিনি যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (রঃ) বলেন তা শুনে আমার অন্তরে কিছু খটকা লাগল। তারপর আমি আবু হুরায়রা (র) কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি ইবনে আব্বাসের বিবরণটি সত্যতা স্বীকার করলেন। (সূত্রঃ মুসলিম শরীফ- ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ২৮, হাদীসঃ ১৫০৬, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)।

* নবী করিম (সাঃ) যোহর ও আসর ৮ রাকাত এবং মাগরিব ও এশা ৭ রাকাত নামায একসাথে আদায় করতেন। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, হাদীসঃ ৫১০, পৃষ্ঠাঃ ২৫৩, আধুনিক প্রকাশনী)।

* বাদলা দিন, সফর অথবা বৃষ্টি জনিত কারন ছাড়াই রাসূল (সাঃ) যোহর ও আসর ৮ রাকাত এবং মাগরিব ও এশা ৭ রাকাত নামায একসাথে আদায় করতেন ইহা অনেক সূত্রে প্রমান রয়েছে। তাই বাদলা দিন হিসেবে অনুমান করা জায়েয নয়। কারন সহীহ আল বুখারীর কথা হিসাবে "অনুমান কখনো জ্ঞান, তথা এল্‌মের সামর্থক নয়। সঠিক ও নির্ভূলভাবে কোন জিনিস জানাকেই এল্‌ম বা জ্ঞান বলা হয়। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৪৩১, আধুনিক প্রকাশনী (নিচের ব্যাখ্যায় উল্লেখিত)।

* আল্লাহ বলছেন, "তাদের অধিকাংশই আনুমানের অনুসরণ করে চলে। সত্যের ব্যাপারে অনুমান কোন কাজেই আসে না। (সূরা ইউনুস, আয়াতঃ ৩৬)।

* ইমাম বাকের (আঃ) বলেন, যখন সূর্য আকাশের মাঝামাঝি এসে পৌছে তখন যোহর ও আসরের নামায আদায়ের সময় ঘনিয়ে আসে আর যখন সূর্য অস্ত যায় তখন মাগরিব ও এশার নামায আদায়ের সময় উপস্থিত হয়। (সূত্রঃ ওয়াসায়েলুশ শিয়া খন্ডঃ ৩, মাওয়াকিত অধ্যায় বাব-৪ রেওয়ায়েত ১)।

* ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বলেন, যখন সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ে তখন যোহর ও আসরের নামাযের সময় উপস্থিত হয়। তবে যোহর নামায আসরের নামাযের পূর্বে সম্পাদন করতে হবে। তখন তুমি সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঐ দুই নামাযকে যে কোনো সময় সম্পাদন করার ব্যাপারে স্বাধীন। (সূত্রঃ ওয়াসায়েলুশ শিয়া খন্ডঃ ৩, মাওয়াকিত অধ্যায় বাব-৪, রেওয়ায়েত-৪ ও ৬)।

* ইমাম বাকির (আঃ) মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে বলেনঃ হযরত যোহর ও আসর এবং মাগবির ও এশা নামাযকে কোনো প্রকার শত্রুর ভয় বা ভ্রমণ অবস্থা ব্যতীতই বা কোনো প্রকার কারণ ও সমস্যা ব্যতীতই একত্রে আদায়

করেছেন। (সূত্রঃ ওয়াসায়েলুশ শিয়া খন্ডঃ ৩, মাওয়াকিত অধ্যায় বাব-৪, রেওয়ায়েত- ১, ৪, ৬; গ্রন্থস্বত্তঃ ইমামিয়া বিশ্বাসের সনদ, পৃষ্ঠাঃ ২২৭)।

* কোনো কোনো রেওয়ায়েতে, এ কাজের দর্শন সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। যেমন একটি রেওয়ায়েতে আমরা পাঠ করিঃ " মহানবী (সাঃ) যোহর ও আসর এবং অনুরূপ মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করেছেন। তখন তাঁকে (সাঃ) এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন আমি এমনটি করেছি যাতে আমার উম্মতের জন্যে কর্তব্য পালন করা কষ্টকর ও কঠিন না হয়। (সূত্রঃ মুয়াত্তা মালিকের শারহে যারকানী, খন্ডঃ ১, দুটি নামায একত্রে পড়া সম্পর্কিত অধ্যায় পৃষ্ঠাঃ ২৯৪, গ্রন্থস্বত্যঃ ইমামিয়া বিশ্বাসের সনদ, পৃষ্ঠাঃ ২২৮)।

* ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন সূর্য উদয়ের সময় কিংবা সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় নামায আদায়ের জন্য মনস্থ না করে। (জলদি না করে)। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ২৬৭, হাদীসঃ ৫৫০, আধুনিক প্রকাশনী)।

* প্রিয় নবী (সাঃ)এর দেওয়া এ বিধান সালাত আদায়ের জন্য সার্বজনীন বিধান, যা সালাত কায়েমের অনুশীলন হিসেবে প্রয়োগ করেছেন। এভাবে নিয়মিত নামায পড়ার মাধ্যমে সালাত কায়েমের প্রচেষ্ঠা চালানো হয়। সালাত কায়েম হয়ে যাওয়াটা মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। সালাত কায়েমের উদ্দেশ্যেই নামায পড়তে হয়।

নামাযে দোআ কুনুত পড়া প্রসঙ্গে

* আল্লাহ্ বলছেন, "হে বিশ্বাসিগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা (অর্থাৎ- দোয়া) কর। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সহিত আছেন" (সূত্রঃ আল কোরআনঃ সূরা বাকারা, আয়াতঃ ১৫৩, শুরা নংঃ ২)।

* নামাযে সালামের পূর্বে দোআ করা (অর্থাৎ- নামায শেষ করা হয় সালাম দিয়ে তাই সালাম শেষ করার পূর্বে নামাযের মধ্যেই দোআ (কুনুত) করতে হবে। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩৫৭, হাদীসঃ ৭৮৬)।

* রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সব নামাযে দোআয়ে কুনুত পরতেন। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৪৩, হাদীসঃ ৭৫৩, পৃষ্ঠাঃ ৪১৮, হাদীসঃ ৯৪২-৯৪৫)।
* রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেই দোআ কুনুত পড়েছেন। (সূত্রঃ আবু দাউদ, আসসাররাজ, দারা কুতনী-সহীহ সনদে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামায- পৃষ্ঠাঃ ২০৫ (মাওলানা দাউদ ইব্রাহীম, খতিব উত্তরা জামে মসজিদ)।

* নবী করীম (সাঃ) ফজর ও মাগরীবের নামাযেও কুনূত পাঠ করতেন। (সূত্রঃ আবু দাউদ শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩০৮, হাদীসঃ ১৪৪০-১৪৪১, সহীহ আল বুখারী ১ম খন্ড, হাদীসঃ ৯৪৫, পৃষ্ঠাঃ ৪১৮, আধুনিক প্রকাশনী)।

* নামাযের মধ্যে কুনুত অবশ্যই পড়া হত (অর্থাৎ- প্রত্যেক নামাযের মধ্যেই দোআ কুনুত পাঠ করা হতো। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, হাদীসঃ ৯৪৩, আধুনিক প্রকাশনী)।

* মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রাঃ) হতে বর্ণিত। আনাস ইবনে মালেক বলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে রুকুর পূর্বে কুনুত পড়েছেন। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, হাদীসঃ ৯৪২, পৃষ্ঠাঃ ৪১৮, আধুনিক প্রকাশনী)।

নামাযে তাকবীর করা প্রসঙ্গে

* রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরয কিংবা অন্য যে কোন নামাযেই হোক রমযান ও অন্যান্য মাসেও নামাযে দোআ পড়তেন ও তাকবীর করতেন। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩৪৫, হাদীসঃ ৭৫৯, আধুনিক প্রকাশনী)।

* রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে 'তাকবীরে তাহরীমা অর্থ আল্লাহু আকবার' বলতেন। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩২০, হাদীসঃ ৬৯১-৬৯৫ ও ৭৪৫,৭৯৪, আধুনিক প্রকাশনী)।

* রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে বাইশবার তাকবীর পড়তেন। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩৪০, হাদীসঃ ৭৪৪, আধুনিক প্রকাশনী)।

* তাকবীরে তাহরীমার সময়, রুকুতে যাবার সময় এবং রুকু থেকে মাথা উঠাবার সময়, তিনি মোট তিন সময়ে রাফে ইয়াদাইন করতেন। এই তিন সময় তিনি যে 'রাফে ইয়াদাইন' করতেন, সে সম্পর্কে প্রায় ত্রিশজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে এর বিপরীত কোনো প্রমান পাওয়া যায়না। মৃত্যু পর্যন্ত সারাজীবন তিনি এ নিয়মেই নামায পড়তেন। (সূত্রঃ আল্লাহ্‌র রাসূল কিভাবে নামায পড়তেন; আল্লামা হাফিয ইবনুল কায়্যিম, অনুবাদ ও সম্পদনা- আবদুস শহীদ নাসিম, প্রকাশক- সেহেলী শহীদ, বর্ণালি বুক সেন্টার, বাংলাবাজার, ঢাকা)।

* সহীহ বুখারি ও মুসলিমে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নামাযের সমাপ্তি বুঝতে পারতাম তাঁর তাকবীর উচ্চারণ করা থেকে। (সূত্রঃ মেশকাত শরীফ, ৩য় খন্ড, হাদীসঃ ৮৯৭)।

* রুকুর পূর্বে ও পরে এবং দু'রাকাতের পর তৃতীয় রাকাতে দাঁড়াবার পর হাত তোলা (তাকবীরে তাহরীমা ও রফউল ইয়াদাঈন)। (সূত্রঃ মিশকাতঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদী আযমী, ২য় খন্ড, হাঃ ৭৩৭-৭৩৯, মিশকাত (মাদ্রাসার পাঠ্য) ২য় খন্ড, হাঃ ৭৩৭-৭৪০; বুখারী শরীফঃ মাওলানা আজীজুল হক- ১ম খন্ড, হাদীসঃ ৪৩২-৪৩৪; সহীহ আল বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩২১, হাঃ ৬৯২, ৬৯৩, ৬৯৫; মুসলিম শরীফ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) ২য় খন্ড, হাঃ ৭৪৫, ৭৪৬, ৭৪৮; আবূ দাউদ (ই.ফা.বা) ২য় খন্ড, হাঃ ৮৪২, ৮৪৩, ৮৪৪; তিরমিযী (ই.ফা.বা) ১ম খন্ড, হাঃ ২৫৫; জামে তিরমিযী, মাওলানা আব্দুন নূর সালাফী- ১ম খন্ড, হাদীসঃ ২৪৭)।

* প্রচলিত সালাত তাকবীরে তাহরীমের সময়ই কেবল রফউল ইয়াদাঈন বা কাঁধ বরাবর দু'হাত উঠানো হয়, কিন্তু রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকু হতে উঠার সময় এবং তিন বা চার রাক'আত বিশিষ্ট সালাতে দ্বিতীয় রাক'আত পড়ে উঠার সময় রফউল ইয়াদাঈন বা কাঁধ বরাবর দু'হাত উঠানো হয় না। এটা সহীহ হাদীস বিরোধী। বরং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সালাত শুরু করার সময় অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমায়, রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকু থেকে উঠার সময় এবং দু'রাকাত পড়ে তৃতীয় রাকাতের জন্য উঠে রফউল ইয়াদাঈন করতেন। (সূত্রঃ

বুখারী ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১০২; মুসলিম ১ম খন্ড, পৃঃ ১৬৮; আবু দাউদ ১ম খন্ড, পৃঃ ১০৪-১০৫; তিরমিযী ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৫; নাসাঈ পৃঃ ১৪১-১৫৮,১৬২; ইবনু মাজাহ্, পৃঃ ৬২; মিশকাত পৃঃ ৭৫; সহীহ ইবনু খুযাইমাহ, পৃঃ ৯৫-৯৬; সহীহ আল বুখারী আধুনিক প্রকাশনী ১ম খন্ড, পৃঃ ৩২১)। (গ্রন্থস্বত্বঃ মাওলানা আব্দুল রউফ (খুলনা), আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা। ২১৪, বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০)।

নামায হাত ছেড়ে আদায় করা প্রসঙ্গে

* কোরআনের নির্দেশ মতে, দ্বীনদারী এবং দ্বীনের কার্যক্রম মহান আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা সহকারে সম্পাদন করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছেঃ 'তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে আল্লাহর উপাসনা করতে এবং দ্বীনকে তাঁর জন্যে একনিষ্ঠ করতে'। (সূত্রঃ আল কোরআন, সূরা বাইয়্যেনাহ- আয়াতঃ ৫)।

* সালাত সেভাবেই কায়েম কর যেভাবে তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের সৃষ্টি করেছেন আর যেভাবে ফিরিয়া আসিবে। (সূরা আরাফ, আয়াতঃ ২৯, শুরা নংঃ ৭)।

* পবিত্র কোরআনের এই আয়াত দ্বারা আমরা স্পষ্ট ধারনা নিতে পারি যে, 'যেভাবে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন' অর্থাৎ যেভাবে আমরা মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে আসি তখন আমাদের উভয়ের হাত সোজা থাকে বাঁধা নয় এবং 'যেভাবে তোমরা ফিরিয়া আসিবে' অর্থাৎ- আমরা যখন আল্লাহর কাছে ফিরে যাই তখন আমাদের উভয় হস্তই প্রসারিত (অর্থাৎ, সোজা) থাকে। তাই নামাযকেও ঠিক একই রুপে আদায় করতে হবে।

* সালাতে যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। (সূরা নেসা, আয়াতঃ ১০২, শুরা ৪)।

* প্রত্যেকেই জানে তাহার ইবাদতের ও পবিত্রতা ঘোষণার পদ্ধতি, যেভাবে এক পাখি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা মহিমা ঘোষণা করে উড়ন্ত অবস্থায় ডানা ছড়িয়ে। (সূত্রঃ আল কোরআন, সূরা নূর, আয়াতঃ ৪১, শুরা নংঃ ২৪)।

* পবিত্র কোরআনের এই আয়াত দ্বারা আমরা আরো প্রমান পাই যে, পৃথিবীতে প্রত্যেকেই আল্লাহর ইবাদতের মহিমা জানে, একটি পাখি যখন আকাশে উড়ন্ত অবস্থায় থাকে তখনই সে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে থাকে। তাহলে পাখি যখন আকাশে উড়ে তখন তার ডানা মেলে উড়ে এবং তার দুটো ডানা সোজা রেখে উড়তে থাকে যদি সে তার হাতকে (ডানা) বন্ধ বা বেঁধে রাখে তাহলে সে উড়ন্ত অবস্থাতেই পরে যাবে তখন সে তার ইবাদত থেকে সরে যাবে থেমে যাবে তার ইবাদত। তাই নামাযকেও ঠিক একই রুপে আদায় করতে হবে।

* বজ্রধ্বনি তাঁর (আল্লাহর) প্রশংসায় তসবিহ পড়ে। (সূত্রঃ আল কোরআন, সূরাঃ রাদঃ আয়াত- ১৩)।

* ইয়াহুদীরা বলে, আল্লাহ্‌র হাত বাধা, উহারাই হাত বাধা এবং যারা বলে তার জন্য উহারাই অভিশপ্ত, বরং আলাহ্‌র উভয় হস্তই প্রসারিত। (সূত্রঃ আল কোরআন, সূরা মায়িদা, আয়াতঃ ৬৪, নংঃ ৫)।

* যাহারা মুনাফিক নর ও নারী উহারা হাত বদ্ধ করিয়া রাখে। (সূত্রঃ আল কোরআন, সূরা তাওবা, আয়াতঃ ৬৭, শুরা নংঃ ৯)।

* হাত বাঁধা অবস্থায় নামায পড়া ইমামীয়া বা শীয়াদের ফিকাহ্‌শাস্ত্রে বিদ'আত বা হারাম বলে পরিগণিত হয়। আমীরুল মুমিনীন বলেনঃ "নামাযীরা যখন আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়ায় তখন যেন তার হস্তদয়কে পরস্পরের উপর না রাখে (অর্থাৎ হাত না বাঁধে) কারণ, এরূপ আমলের দ্বারা মাজুসী কাফেরদের সাদৃশ্য প্রকাশ করে। (সূত্রঃ ওয়াসায়েলুশ শীয়া, ৪র্থ খন্ড, অধ্যায়-১৫, হাদীসঃ ৭; গ্রন্থস্বত্যঃ ইমামিয়া বিশ্বাসের সনদ, পৃষ্ঠাঃ ২৩১)।

* প্রখ্যাত সাহাবী আবু হামিদ সায়েদী একদল সাহাবী যাদের মধ্যে আবু হুরায়রা দুসী, সাহাল সায়েদী, আবু ওসাইদ সায়েদী, আবু কাতাদাহ, হারেস ইবনে রাবয়ী এবং মোহাম্মদ ইবনে মোসলামাহও ছিলেন তাদের জন্যে মহানবী (সাঃ) থেকে নামায পড়ার পদ্ধতি এবং ছোট-বড় মোস্তাহাবগুলোও বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এরূপ কোনো আমলের কথা (হাতের উপর হাত বাঁধা) বর্ণনা

করেন নি। স্পষ্টতই যদি মহানবী (সাঃ) কদাচিৎ একাজটি করতেন তবে তা তিনি বর্ণনা করতেন এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে স্বরণ করিয়ে দিতেন। সায়েদীর হাদীসের অনুরূপ হাদীস হাম্মাদ ইবনে ঈসার মাধ্যমে ইমাম জাফর সাদেক (আঃ)-এর ভাষায় আমাদের হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। (সূত্রঃ বায়হাকী সুনান ২/৭২, ৭৩, ১০১, ১০২; সুনানে আবু দাঊদ ১/১৯৪ বাবে এফতেতাহে সালাত, হাদীসঃ ৭৩০,৭৩৬; তিরমিজি সুনান ২/৯৮ বাবে সেফাতুস সালাত; ওয়াসায়েলুশ শিয়া ৪ বাব-১, (আফয়ালে সালাত) হাদীস-৮১)। (গ্রন্থস্বত্যঃ ইমামিয়া বিশ্বাসের সনদ, পৃষ্ঠাঃ ২৩১)।

* আল্লামা শাহ্ ইসমাইল (ভারত) তিনি বলেন যে শিয়ারা নামাযে হাতকে সোজা রেখে আদায় করে এবং এটা শিয়াদের নামায, ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা বরং এটা অবশ্যই রাসূলে খোদা (সাঃ)-এর নামায এবং রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সময়ে হাত সোজা রেখে নামায আদায় করা হতো। (সূত্রঃ হেদায়াতুল মাহ্দী, আল্লামা ওয়াহেদ খান, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১২৬; তানভিরুল য়া'নাঈম (লাহর মুদ্রিত) আলামা ইসমাইল (ভারত-দেওয়াবন্দ) পৃষ্ঠাঃ ২১)।

* হাফেয ইবনুল কাইয়্যেম (রাহঃ) লিখেন- ইমাম মালেক (রাহঃ) হাত ছেড়ে দিয়ে নামায পড়তে বলেছেন। ইমাম মালেকের অনুসারীরা সবাই এভাবে নামায পড়তে শুরু করে দিয়েছে। (সূত্রঃ মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ ইদরীছ কাছেমী, পত্রিকাঃ ইনকেলাব, ঢাকা বৃহস্পতিবার, ২১ মে ২০০৯, ধর্ম দর্শন)।

* মুসলমানগণের অন্যান্য ফেরকার নামায সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় যদিও বিভিন্ন পুস্তক রচিত কিন্তু তাহাদের মধ্যে ও নিয়ম বা তরিকায় অনেক মতভেদ দেখা যায় কিন্তু কেবল শী'আ ফেরকার মধ্যে কোনও মতভেদ নাই। শী'আগন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁহার আহলে বায়েত (আঃ) ও পরবর্তী ইমামগণের হেদায়েতের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহাদের বর্ণিত হাদিস মূলে নামায ও দ্বীনি সমস্ত আমল করিয়া থাকেন কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে মুসলমানগণের অন্যান্য ফেরকা যাহারা এক খোদা, এক রাসূল ও একই কোরআনের ঈমানধারী তাহাদের মধ্যে এত মতভেদ ও ইবাদতের বিভিন্ন তরিকা কেন?

নামাযে হাত বাঁধা রাসূলের নাপসন্দ নামায

* আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আঃ) কোমরে হাত রাখা নাপসন্দ করতেন এবং বলতেন, ইয়াহুদীরাই এরূপ করে। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৪০১, হাদীসঃ ৩২০০, আধুনিক প্রকাশনী)।

* আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) কাউকে কোমরে হাত রেখে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৪৯৭, হাদীসঃ ১১৪০, আধুনিক প্রকাশনী)।

* হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেনঃ রাসূল (সাঃ) নিষেধ করেছেন নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রাখিয়া দাঁড়াইতে। (ইহাতে নামায মাকরূহ হইবে।) (সূত্রঃ মেশকাত্ শরীফ, ৩য় খন্ড, হাদীসঃ ৯১৮-(৪), পৃষ্ঠাঃ ১২, সন-২০০৬)।

* প্রচলিত নামাযে দাঁড়িয়ে নাভীর নীচে হাত বাঁধা হয়। এটাও সহীহ হাদীসের বিপরীত। (সূত্রঃ বুখারী ১ম খন্ড, পৃঃ ১০২; মুসলিম ১ম খন্ড, পৃঃ ১৭৩; আবু দাউদ ১ম খন্ড, পৃঃ ১১০; তিরমিযী পৃঃ ৩৪/৩৫; নাসাঈ পৃষ্ঠাঃ ১৪১; ইবনু মাজাহ পৃঃ ৫৯; মিশকাত পৃঃ ৭৫; সহীহ ইবনু খুযাইমাহ ১ম খন্ড, পৃঃ ২২৩; মুআত্তা মুহাম্মদ পৃষ্ঠাঃ ১৬০) গ্রন্থস্বত্তঃ মুফতী মোহাম্মদ আবদুর রউফ (খুলনা),আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা, ২১৪, বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০।

* সাহল ইবনে সাদ থেকে বর্ণিত হাদীসে আমরা পাই যে, হাত বেঁধে নামায পড়া মহানবী (সাঃ)-এর পরে চালু হয়েছে। কারণ তিনি বলেন, "মানুষকে একাজের জন্য আদেশ করা হত" যদি মহানবী (সাঃ)-এর আদেশ হত তবে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করা হত। (সূত্রঃ ফাতহুল বারী ২/২২৪ এবং সুনানে বায়হাকী ২/২৮)।

* অতঃপর তাদের পরে এল অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা নামায নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হল। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে। (সূত্রঃ আল কোরআন, সূরা মারিয়ামঃ ৫৯-৬০, শুরা নংঃ ১৯)।

* সুতরাং দূর্ভোগ সেই সালাত আদায় কারীদিগের, যাহারা তাহাদিগের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যাহারা লোক দেখানোর জন্য উহা করে। (সূত্রঃ আল কোরআন, সূরা মাউন, আয়াতঃ ৪-৬)।

* রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর পর নামায নষ্ট হতে চলেছে। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ২৪৯, হাদীসঃ ৪৯৯, আধুনিক প্রকাশনী)।

* আম্‌র ইবনে যুরারা (র) যুহরী (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি দামেশকে আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) এর নিকট উপস্থিত হলাম, তিনি তখন কাঁদছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর যুগে যা কিছু পেয়েছি তার মধ্যে কেবল মাত্র সালাত ছাড়া আর কিছুই বহাল নেই। কিন্তু সালাতকেও নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। বাক্‌র (র) বলেন আমার কাছে মুহাম্মদ ইবনে বাক্‌র বুরসানী (র), উসমান ইবনে আবু রওওয়াদ (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (সূত্রঃ বুখারী শরীফ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৮, হাদীসঃ ৫০৫, (ইফাবা) হাদীস নংঃ ৫০৪)।

* রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'তোমরা সেভাবেই নামায আদায় কর যেভাবে আমাকে নামায আদায় করতে দেখ। (সূত্রঃ বুখারী, মিশকাত আরবী ৬৬ পৃষ্ঠা; মিশকাত বাংলা আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২য় খন্ড, কিতাবুস সালাত পৃষ্ঠাঃ ৫৮, হাদীসঃ ৬৬২)।

* হযরত আলী (আঃ)এর নামায রাসূল (সাঃ)এর নামাযের সদৃশ্য পূর্ণ। অর্থাৎ রাসূল (সাঃ) যেভাবে নামায পড়তেন হযরত আলী (আঃ) ঠিক সেই ভাবে নামায পড়তেন ও পড়াতেন। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩৫৪, হাদীসঃ ৭৪০, ৭৪২, আধুনিক প্রকাশনী)।

* মুতার্‌রাফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি এবং ইমরান ইবনে হোসাইন, আলী ইবনে আবু তালিবের পিছনে কোন এক সময় নামায পড়লাম। তিনি নামাযে সালাম শেষ করার পর ইমরান আমার হাত ধরে বললেন, এ ব্যক্তি (হযরত আলী) আমাদেরকে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর

নামাযের সাথে সদৃশ্যপূর্ণ নামায পড়ালেন এবং বললেন এ ব্যক্তি আমাদেরকে রাসূলের নামাযের কথা সরণ করিয়ে দিলেন অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) যেভাবে নামায পড়তেন হযরত আলী (আঃ)ও ঠিক সেই ভাবে নামায পড়লেন। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী- ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩৫৪, হাঃ ৭৮০, আধুনিক প্রকাশনী)

* রেওয়ায়েতে পাওয়া যায় সাহাবারা কুফার মসজিদে আলাপ করিয়াছেন এতদিন পর আলীর ইমামতে সেইরূপ নামায পড়িলাম, যেভাবে আমরা রাসূলের পিছনে পড়িয়াছি। (সূত্রঃ মেশকাতুল মাসাবীহ, তাজরীদুল বুখারী)

* তাহলে এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পরে যেভাবে নামায আদায় করা হত সেটা কি ব্যঠিক ছিল? যদি ঠিক থাকতো কিংবা রাসূলের মতই নামায থাকতো তাহলে কেন সাহাবারা বললেন এ ব্যক্তি (হযরত আলী) আমাদেরকে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নামাযের সাথে সদৃশ্যপূর্ণ নামায পড়ালেন ও রাসূলের নামাযের কথা সরণ করিয়ে দিলেন এবং কুফার মসজিদে আলাপ করছিলেন এতদিন পরে তারা রাসূলের নামাযকে হযরত আলীর দ্বারা ফিরে পেলেন হযরত আলীর নামাযই ঠিক। তাহলে হযরত আলীর (আঃ) খেলাফতের পূর্বে যেভাবে নামায পড়া হত সে নামায কি শুদ্ধ ছিল না? যদি সঠিক থাকতো তাহলে এমন প্রশ্ন আসবে কেন?

* আমিরে মুয়াবিয়ার হুকুমতে এক সাহাবা বলিতেছিলেন, ইসলামের এক নামায ছারা আর সবকিছুইত চলিয়া গিয়াছিল, এই লোকটির আমলে সে নামাযও গেল। (সূত্রঃ তাজরিদুল বুখারী, মিশকাতুল মাসাবিহ্- নামায প্রসঙ্গে)

* রাসূলুলাহ (সাঃ)-এর পর যারা হুকুমতে এসেছিলেন তারা পবিত্র নামাযকেও গড়মিল করে ফেলেছিলেন আর হযরত আলী (আঃ) এর দ্বারা যেও নামাযটি সঠিক ভাবে রাসূলের নামাযের রূপ ফিরে পায় আমিরে মাবিয়ার আমলে সেটিও গেল। তাহলে এখানে বুঝাযাচ্ছে হযরত আলী (আঃ)-এর খেলাফতের পূর্বেও নামাযে গড়মিল এবং পরেও গড়মিল করে ফেলেছে। একমাত্র হযরত আলী (আঃ) ও তাঁর খেলাফতের সময়টিই সঠিক পথ এবং সঠিক নামাযের

রূপ প্রকাশ পায় । তাই এখানে বিবেচনা করে দেখাযায় যে, হযরত আলী (আঃ) এর অনুসারিদের দ্বারাই সত্য পথের এবং সঠিক নামাযের সন্ধান পাওয়া যায় । তাই হযরত মুহামাদ (সাঃ) আগেই বলেদিয়েছেন, ‘হযরত আলী (আঃ) হকের সাথে এবং হক আলীর (আঃ) সাথে ।’ (সূত্রঃ সহীহ তিরমিজি, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ২৯৮; তারিখে বাগদাদ লীল খাতিবুল বাগদাদ, ১৪ তম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩২১) ।

* তাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ ‘ওহে আমার আনসারগণ আমি তোমাদের এমন এক ব্যক্তির খবর দিতেছি যে, তোমাদেরকে সত্য পথে চলিবার হেদায়েত করিবে । এবং তোমরা যদি তাহার অনুসরণ কর তবে কখনো পথ ভ্রষ্ট হইবে না এবং সেই ব্যক্তি একমাত্র হযরত আলী (আঃ) বটেন, যিনি তোমাদেরকে সত্য পথে হেদায়েত করিবেন । (সূত্রঃ কানজোল আ’মাল, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৫৬)

সিজদাগাহ্ ও মাটিতে সিজদা করা প্রসঙ্গে

* যা কিছু আসমান ও জমিনে বিরাজমান তারা সবাই আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সিজদা করে থাকে । (সূরা রাদ-আয়াতঃ ১৫) ।

* তুমি বল, ‘তোমরা ইহাতে বিশ্বাস কর আর না-ই কর, নিশ্চই ইহার পূর্বে যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নিকট যখন ইহা পড়িয়া শুনান হয়, তাহারা মাটিতে মুখ লাগাইয়া সিজদাহ্ করে’ ‘এবং তাহারা মাটিতে কপাল রাখিয়া কাঁদিতে থাকে এবং উহাতে তাহাদের মিনতি বৃদ্ধি পায় ।’ (সূত্রঃ আল কোরআন, সূরা বনি-ইসরাইল, আয়াতঃ ১০৭-১০৯) ।

* হযরত মুসা (আঃ) প্রত্যেক নামায অন্তে স্বীয় মুখমন্ডলের ডান ও বাম পাশকে মাটিতে রাখতেন । (কিসারুল জুমাল, গ্রন্থস্বত্তঃ নামাযের শিক্ষা, ওস্তাদ মহসীন ক্বারাআতী ।)

* হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যে “আল্লাহর বন্ধু” কে পরিণত হন এবং ‘খলিলুল্লাহ’ উপাধি লাভ করেন তার কারণ ছিল দীর্ঘ সিজদা। (সূত্রঃ মুস্তাদরাকুল ওসায়েল, খন্ড ১, পৃষ্ঠাঃ ৩২৯)।

* ইমাম কাযিম (আঃ) ফজরের নামায শেষে সিজদায় মাথা রাখতেন এবং দিনের কিয়দাংশ সিজদা অবস্থায় থাকতেন। (সূত্রঃ কিসারুল জুমাল)।

* ইমাম জয়নুল আবেদীন (আঃ) আল্লাহর নামকে এতবেশি পুণরাবৃত্তি করতেন এবং সিজদাকে দীর্ঘয়িত করতেন যে, যখন মাথা তুলতেন তখন ঘামে তাঁর শরীর ভিজে থাকতো। (সূত্রঃ বিহারুল আনোয়ার, খন্ডঃ ৮২, পৃষ্ঠাঃ ১৩)।

* তাঁকে এ কারণে “সাজ্জাদ” বলা হয় যে, তিনি দীর্ঘ সিজদা করতেন আর সিজদার চিহ্ন তাঁর কপাল ও সিজদার অঙ্গসমূহে প্রকাশমান হয়ে পড়তো। (সূত্রঃ ওসায়িলুশ শিয়া, খন্ডঃ ৪, পৃষ্ঠাঃ ৯৭৭)।

* মাটি ও কাদার ওপরেও নাক দ্বারা সিজদা করতে হবে। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩৫০, হাদীসঃ ৭৬৭-অনুচ্ছেদ, আধুনিক প্রকাশনী)।

* রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর কপালে মাটির চিহ্ন থাকতো। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩৫৮, অনুচ্ছেদ)।

* রাসূল (সাঃ) মাটিতে সিজদা করতেন। এমনকি তাঁর কপালে কাদা মাটির চিহ্ন লেগে থাকতো। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩৫৯, হাদীসঃ ৭৮৯, আধুনিক প্রকাশনী; আবু দাউদ শরীফ, ২য় খন্ড, হাঃ ৯১১, পৃঃ ২৩)।

* সাহল ইবনে সা’আদ (রাঃ) ও সত্যবাদী বারাআ ইবনে আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার কপাল মাটিতে স্থাপন করতেন। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩৫০, হাদীসঃ ৭৬৬, পৃষ্ঠাঃ ১৯৭, হাদীসঃ ৩৬৪; মেশ্‌কাত শরীফ, তয় জেল্‌দ, হাঃ৯১৭-(৩)এমদাদিয়া পুস্তকালয় লাঃ ঢাকা)।

* ‘কাঠের ওপর নামায পড়া’ হাসান বসরী এটাকে জায়েয মনে করেন। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৯৬, অনুচ্ছেদ, আধুনিক প্রকাশনী)।

* রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণিতঃ **“মাটিকে আমার জন্য সেজদাগাহ্ ও পবিত্রতার উৎস হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে”**। (সূত্রঃ সহীহ মুসলীম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩৭১; সুনানে তিরমিজি, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৩১, ১৩৩; সুনানে বায়হাকী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ২১২; এবং ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ২৯১।

* রাসূলাল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণিতঃ “তোমরা ললাটকে (কপাল) মাটির উপর স্থাপন কর”। (সূত্রঃ কানজুল আমাল, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৯৯, ২১২; আহকামে কোরাআন, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ২০৯; (জাসৃসাসে হানাফী) বৈরুতে মুদ্রিত)।

* নবী (সাঃ)এর স্ত্রী উম্মে সালমা বলেন যে, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, “স্বীয় মুখমন্ডলকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে মাটির উপর স্থাপন কর। সুত্রঃ কানজুল উম্মাল, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ৪৬৫ (কিতাবুস সালাত) ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৯৯, ২১২)।

* হযরত আবু বকর মাটির উপর সেজদা করতেন। (সুত্রঃ আল মুসান্নেক, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩৯৭)।

* কাপড়ের উপর, পরিধেয় বস্ত্রের উপর এবং খাবার দ্রব্যের উপর সিজদা করা যাবেনা। রাসূলে খোদা (সাঃ) সিজদার সময় কাপর অথবা পাগড়ী কপাল থেকে তুলে নিতে বলেছেন। যাতে সিজদার সময় কোন কাপর অথবা পাগড়ী কপালে স্পর্শ না করে। (সূত্রঃ কানজুল উম্মাল, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ২১২; সুনানে বায়হাকী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১০৫, ১৪৫; বিহারুল আন্ওয়ার)।

* রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কপাল ও নাক যমীনে স্থাপন করতেন। তিনি পাগড়িতে ঢাকা কপালে নয়, খালি কপালে সিজদা করতেন। পাগড়িতে ঢাকা কপালে সিজদা করতেন বলে কোনো সহীহ্ হাদীসে প্রমান নেই। এমন কি কোন হাসান হাদীসেও প্রমান নেই। তাহলে এখানে স্পষ্ট প্রমান হয় যে কাপরের উপর সিজদা ওয়াজিব নয়। (সূত্রঃ আল্লাহ্র রাসূল কিভাবে নামায পড়তেন, পৃষ্ঠাঃ ৪৯, আল্লামা হাফেয ইবনুল কায়্যিম)।

* হিসাম বিন আল হাকাম বলেনঃ ইমাম জাফার সাদেক (আঃ) কে সিজদা শুদ্ধ হয় এমন সব জিনিস সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেনঃ “সিজদা শুধুমাত্র যমিন ও তা থেকে উৎপন্ন বস্তুসমূহের (খাবার দ্রব্য ও পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত) উপর সম্পাদন করতে হবে।” (সূত্রঃ বিহারুল আন্ওয়ার, খন্ড-৮২, পৃষ্ঠাঃ ১৪৭; খন্ড ৮৫, পৃষ্ঠাঃ ১৪৯)।

* ইমাম সাদিক (আঃ) ইমাম হুসাইন (আঃ) এর মাযারের মাটির উপরে ছাড়া সিজদা করতেন না। তিনি বলতেন হুসায়েন (আঃ) এর মাটিতে সিজদায় এমন এক জ্যোতিময় নিহিত রয়েছে যা সকল পর্দাকে বিদর্ণ করে। (সূত্রঃ বিহারুল আনোয়ার, খন্ড ১০৩, পৃষ্ঠাঃ ১৩৫)।

* শিয়ারা বিশ্বাস করে যে, নামাযের সময় মাটিতে অথবা যা কিছু মাটি থেকে উৎপন্ন হয় (তবে শর্ত হলো খাদ্যদ্রব্য বা পরিধেয় নয়) তার উপর সিজদা করতে হবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে এ দু'টির ভিন্ন অন্য কোনো কিছুর উপর সিজদা করা সঠিক নয়। মহানবী (সাঃ) থেকে যে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে এবং আহলে সুন্নাতও যা বর্ণনা করেছে তাতে, এটাই সুস্পষ্ট হয় যে, “মাটিকে আমাদের জন্যে সিজদা ও তায়াম্মুমের স্থানরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানে (তাহুর) শব্দটি তায়াম্মুমের প্রতি ইঙ্গিত করে। (সহীহ বুখারী ১/৯১ কিতাবে তায়াম্মুম, হাদীসঃ ২; গ্রন্থস্বত্যঃ ইমামিয়া বিশ্বাসের সনদ, পৃঃ ২২৫)।

* মাটি এবং যা কিছু মাটি থেকে উৎপন্ন হয় তার উপর ব্যতীত সিজদা হবে না তবে শর্ত হলো (মাটি থেকে উৎপন্ন বস্তু) খাদ্যদ্রব্য বা পরিধেয় না হওয়া। (সূত্রঃ ওয়াসায়ীল খন্ডঃ ৩, বাব-১ যার উপর সিজদা অধ্যায়ে প্রথম হাদীস, পৃষ্ঠাঃ ৫৯১)।

* হুজুর (সাঃ) একজন সাহাবীকে যে তার কপাল মাটিতে লেগে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে চলতোঃ তাকে আদেশ দিলেন, তোমার কপালে মাটি লাগাও। (সূত্রঃ কানযুল উম্মাল ৭/৪৬৫, হাদীসঃ ১৯৮১০)।

* তদ্রূপ যদি সাহাবীদের কেউ কখনো তাদের পাগড়ির আচঁলে সিজদা করত, মহানবী (সাঃ) তাদের কপালের নিচ থেকে তা টেনে বের করে দিতেন। (সূত্রঃ সূনানে বায়হাকী ২/১০৫)।

* বলা বহুল্য সাইয়্যেদুশ শুহাদা ইমাম হুসাইন (আঃ) এর মাটির উপর সিজদা করা দ্বীনের রাস্তায় আত্মোৎসর্গ এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ ও শাহাদাতের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করে। আর নামাযী ব্যক্তিদেরকে কারবালায় চিত্রায়িত শাহাদাত ও লড়াইয়ের সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করে দেয়।

* আমাদের জীবনে, চলাফেরায়, জিহাদে, ইবাদতে প্রভৃতি ক্ষেত্রে মাসুম ইমামগণই আমাদের আদর্শ। তাঁদের নামাযও আমাদের জন্য আদর্শ। আশা করা যায় ঐ মহান ইমামগণের (আঃ) আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার দৃষ্টান্তগুলো আমাদের জন্য আদর্শ হবে।

দ্বিতীয় সিজদার পর ঠিক ভাবে বসা ও উঠা প্রসঙ্গে

* প্রচলিত নামাযের প্রথম ও তৃতীয় রাক'আতে অর্থাৎ বেজোড় রাকাতে সিজদাহ্ হতে উঠে 'না বসে' সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়া হয়। এটা সুন্নাত বিরোধী। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বেজোড় রাকাতে অর্থাৎ প্রথম ও তৃতীয় রাকাতে সিজদাহ হতে মাথা তুলে স্থির হয়ে কিছুক্ষন বসে তারপর দাঁড়াতেন। এটাই সুন্নাত। (সূত্রঃ বুখারী ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১১৩; আবূ দাউদ ১১১-১১২; তিরমিযী পৃষ্ঠাঃ ৩৮; নাসাঈ পৃষ্ঠাঃ ১৭৩; ইবনু মাজাহ পৃষ্ঠাঃ ৬৪; মিশকাত, পৃষ্ঠাঃ ৭৫; গ্রন্থস্বত্তঃ মুফতী মোহাম্মদ আবদুর রউফ (খুলনা), আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা, ২১৪ বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০।।

* আবু কেলাবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালেক ইবনে হুয়াইরিছ রাসূল (সাঃ) সম্বন্ধে বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠার সময় ঠিক ভাবে মাটিতে বসতেন তারপর উঠে দাঁড়াতেন। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩৫৪, হাদীসঃ ৭৭৮, আধুনিক প্রকাশনী)।

* বিজোর রাকাতে অর্থাৎ ১ম ও ৩য় রাকাতের সিজদাহ্ শেষ করে সরাসরি না দাঁড়িয়ে সিজদাহ্ শেষ করে (অর্থাৎ ২য় সিজদাহ্ করার পর) বসে তারপর দাঁড়ানো। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী (আধুনিক প্রকাশ) ১ম খন্ড, হাঃ ৭৫, ৭৭৩, ৭৭৭; বুখারী শরীফ (ই.ফা.বা) ২য় খন্ড, হাঃ ৭৮৩; মুসলিম শরীফ (ই.ফা.বা) ২য় খন্ড, হাঃ ৭৬৯; আবু দাউদ (ই.ফা.বা) ১ম খন্ড, হাঃ ৮৪২, ৮৪৩, ৮৪৪; তিরমিযী (ই.ফা.বা) ১ম খন্ড, হাঃ ২৮৭; জামে তিরমিযীঃ মাওলানা আব্দুন নূর সালাফী-১ম খন্ড, হাঃ ২৭৪; মিশকাতঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী-২য় খন্ড, হাঃ ৭৩৪, ৭৪০; বুখারী শরীফঃ মাওলানা আজিজুল হক-১ম খন্ড, হাঃ ৪৭২, গ্রন্থস্বত্তঃ মুফতী মোহাম্মদ আবদুর রউফ (খুলনা),আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা, ২১৪ বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০।

* আবু কেলাবাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী (সাঃ) যেভাবে নামায আদায় করতেন মালেক ইবনে হুয়াইরেছ তা আমাদেরকে দেখাতেন। আর এটা তিনি দেখাতেন নামাযের ওয়াক্তের বাইরে (কোন সময়ে)। এভাবে একদিন তিনি নামায শুরু করে পূর্ণাঙ্গ রুপে কিয়াম করলেন। অতঃপর রুকু হতে উঠে অল্প কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে থাকলেন। আবু কেলাবাহ বর্ণনা করেন, সেই সময় মালেক ইবনে হুয়াইরেছ আমাদের শায়খ আবু ইয়াযীদের মত নামায আদায় করলেন। আবু ইয়াযীদ শেষ সিজদা থেকে মাথা উঠালে সোজা হয়ে বসতেন এবং কিছুক্ষণ বসে থেকে তারপর দাঁড়াতেন। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী- আধুনিক প্রকাশনী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩৪৪, হাদীস নংঃ ৭৫৮, ৭৭৩, ৭৭৪, ৭৭৭)।

হাত মাটিতে রেখে দাঁড়ানো প্রসঙ্গে

* সিজদায় যেতে প্রথমে হাত পরে হাটু রাখা। (সূত্রঃ মিশকাত: মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী- ২য় খন্ড, হাঃ ৮২৯; মিশকাত (মাদ্রাসার পাঠ্য) ২য় খন্ড, হাঃ ৮২৯; মুসলিম শরীফ (ই.ফা.বা) ২য় খন্ড, হাঃ ৯৮৫; বুখারী শরীফ (ই.ফা.বা) ২য় খন্ড, হাঃ ৭৮৩)। গ্রন্থস্বত্তঃ মুফতী মোহাম্মদ আবদুর রউফ (খুলনা), আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা, ২১৪, বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০।

* সিজদাহ্ হতে দাঁড়াবার সময় হাতে ভর করে দাঁড়ানো। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী- আধুনিক প্রকাশনী, ১ম খন্ড, হাঃ ৭৭৮; বুখারী শরীফ (ই.ফা.বা), ২য় খন্ড, হাদীস নং ৭৮৩)। গ্রন্থস্বত্তঃ মুফতী মোহাম্মদ আবদুর রউফ (খুলনা),আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা, ২১৪, বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০।

* আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তোমাদের কেউ যখন সিজদায় যাবে, সে যেনো উটের নিয়মে না বসে, বরং সে যেনো দুই হাঁটুর আগে দুই হাত রাখে। (সূত্রঃ আবু দাউদ)।

* যাদের মতে হাঁটুর আগে হাত মাটিতে রেখে উঠতে হবে, তাদের মধ্যে রয়েছেন, মালিক ও আওযায়ী। তারা বলেছেন, আমরা দেখতে পেয়েছি লোকেরা হাঁটুর আগে হাত রাখেন। আহলে হাদীসের মতও এটাই। বায়হাকী বলেছেন, হাদীসটি যদি সুরক্ষিত ও অবিকৃত (মাহফুয) থেকে থাকে, তবে এটি সিজদায় যাবার কালে হাঁটুর আগে হাত রাখার পক্ষে একটি দলিল। (সূত্রঃ আল্লাহ্র রাসূল কিভাবে নামায পড়তেন; আল্লামা হাফিয ইবনুল কায়্যিম, পৃষ্ঠাঃ ৪৭, অনুবাদ ও সম্পদনা- আবদুস শহীদ নাসিম, প্রকাশক- সেহেলী শহীদ, বর্ণালি বুক সেন্টার, বাংলাবাজার, ঢাকা, পঞ্চম মুদ্রণ সেপ্টেম্বার -২০০৫)।

নামাযে তাশাহুদ পড়া প্রসঙ্গে

* নামাযে সর্বশেষ সিজদার পর দু'হাটু পেতে বসে তাশাহুদের মাধ্যমে রাসূলের (সাঃ) রেসালাত এবং ইবাদতের প্রতি আর আল্লাহর একত্বের প্রতি সাক্ষ্য প্রদান করি। তাঁর (সাঃ) উপর দরুদ ও সালাম প্রেরণ করি।

* নামাযে তাশাহুদ ও সালাম পাঠ হচ্ছেঃ "আলহামদুলিল্লাহ আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইলাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারিকালাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। তারপর 'আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়ু ওয়া রাহ্মাতুলাহি ওয়া বারাকাতুহু, আস্ সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিলাহিস সালিহীন, আস্ সালামুআলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুলাহি ওয়া বারাকাতুহু। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সালামটি শেষ করে তিনবার জোরে জোরে তাকবির 'আল্লাহু

আকবার’ বলতেন। তারপর আসতাগফিরুল্লাহ লাযি লাইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ূল ওয়া কাইয়ূম জুলজালালি ওয়াল ইকরাম ওয়া আতুবু ইলায়হ্ বলে নামায শেষ করতেন। (সূত্রঃ নিবেদক: মোঃ আবদুল কুদ্দছ, ১/৮ ব্লক বি, লালমাটিয়া-ঢাকা ১২০৭, মোঃ আবু তাহের বর্ধমানী, সম্পদক: সাপ্তাহিক আরাফাত, খতিব- বংশাল জামে মসজিদ ঢাকা)।

* অর্থ: সালাম হোক আল্লাহর সৎ ও উপযুক্ত বান্দাদের প্রতি, আল্লাহর ফেরেশতাকুলের প্রতি আর যারা সালামের উপযুক্ত পাত্র তাদের প্রতি।

* আমাদের নামাযের মধ্যে সালাম সমূহ রাসূল (সাঃ) ও প্রকৃত মুমিনদের সাথে বন্ধনের যোগসূত্র। এ বন্ধন হলো পবিত্র ও সত্যতার সাথে আর পবিত্রগণ ও সত্যবানদের সাথে।

* নামাযে শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পরা, আশ্হাদু আল লাইলাহা.....এবং নবী ও সালেহীন বান্দার উপর সালাম পাঠ করা। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৩৫৭, হাদীস: ৭৮৫, আধুনিক প্রকাশনী)।

* সহীহ মুসলিমে হযরত আয়েশা ও হযরত সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করতেন, তখন তিনবার ‘আসতাগ ফিরুল্লাহ....যুলজালালে ওয়াল ইকরাম’ বলতেন। (সূত্রঃ আল্লাহ্র রাসূল কিভাবে নামায পড়তেন, পৃষ্ঠা: ৯৪)।

* রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের সালাম কে শুনে থাকেন এবং উত্তর দেন। যদিও আমরা তা আঁচ করি না। এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে যে, আমরা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির উপর অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর সালাম প্রেরণ করবো আর তিনি আমাদের সালামের উত্তর দিবেন।

* আমাদের নামাযের সালাম হলো হযরত রাসূলে খোদা (সাঃ) এর দরবারে আমাদের আদবের প্রকাশ এবং তাঁর সেই অপরিসীম পরিশ্রমের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন যা তিনি আমাদের হেদায়েতের জন্যে বরণ করেছেন।

নামাযে মুখ ফিরানো প্রসঙ্গে

* হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আণুগত্য কর এবং তোমরা যখন তাহার কথা শ্রবণ করিতেছ তখন উহা হইতে মুখ ফিরাইও না। (সুত্রঃ আল কোরআন, সূরা আনফাল, আয়াতঃ ২০, শুরা নংঃ ৮)

* নামাযে ঘাড় ফিড়িয়ে এদিক ওদিক তাকানো নিষেধ। (সূত্রঃ আবু দাঊদ শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ২৩, হাদীসঃ ৯১০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)।

* হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে নামাযের মধ্যে এদিক সেদিক দেখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি উত্তর করিলেন ইহা হইতেছে শয়তানের ছোঁ মারা, শয়তান ছোঁ মারিয়া বান্দার নামাযের কিছু অংশ (অর্থাৎ, পূর্ণত্ব) লইয়া যায়। ব্যাখ্যাঃ ঘাড় ফিরাইয়া দেখাতে নামায মাকরূহ হয়। বক্ষ ফিরাইলে নামায একেবারে ফাসেদ হইয়া যায়। (সূত্রঃ মেশ্‌কাত শরীফ, তৃতীয় জিল্‌দ, হাদীসঃ ৯১৯-(৫), এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রঃলিঃ)ঢাকা, সন-২০০৬, মুসলিম ও আবু দাউদ, ২য় খন্ড, হাঃ ৯১০)

* রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে তিনটি কাজ নিষেধ করেছেন। (১) মোরগের মত ঠোকর মারা (এমনভাবে সিজদা করা যেন মোরগ খাদ্যবস্তু ঠোকরাচ্ছে), (২) কুকুরের মত (নিতম্বের উপর) বসা, (৩) শেয়ালের মত এদিক সেদিক তাকানো। (সূত্রঃ আহমদ, মোসনাদে আবু ইয়ালা)

* রাসূলুলাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, নামাযে আল্লাহর দৃষ্টি ততক্ষন বান্দার দিকে নিবদ্ধ থাকে যতক্ষণ সে এদিক ওদিক না তাকায়। সে এদিক ওদিক মুখ ফিরালে আল্লাহও তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। (সূত্রঃ আবু দাউদ, সহীহ ইবনে খোযায়মা, সহীহ ইবনে হেব্বান। ইবনে খোযায়মা ও হেব্বান এ হাদীস সহীহ বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামায- (সম্পাদনা- মাওলানা দাউদ ইব্রাহীম, খতিব উত্তরা জামে মসজিদ) পৃষ্ঠাঃ ৮৩। মীনা বুক হাউস, ১৩, বায়তুল মোকাররম ঢাকা-১০০০।

অযুর নিয়ম প্রসঙ্গে

* অযু হলো নামাযে প্রবেশের অনুমতিস্বরূপ এবং ইবাদত সম্পাদনের আত্মিক ক্ষেত্রস্বরূপ। অযু ছাড়া নামায বাতিল। (সূত্রঃ ওসায়িলুশ শিয়া, খন্ড ১, পৃষ্ঠাঃ ২৫৬)।

* অযু হলো ঈমানের অঙ্গ, অন্তরের জ্যোতি এবং আধ্যাত্মিক মনোসংযোগ দানকারী। ইমাম রেযা (আঃ) এর বর্ণনা মতে, যে ব্যক্তি প্রতিপালকের সম্মুখে ইবাদতের দন্ডায়মান হয় তাকে অবশ্যই কলুষতা থেকে মুক্ত হতে হবে, আলসেমি, ক্লান্তি ও অবসন্নতা থেকে দূরে থাকতে হবে এবং অযুর মাধ্যমে মহাশক্তিমান আল্লাহর সামনে দাঁড়াবার জন্য মনকে পবিত্র ও প্রস্তুত করতে হবে। (সূত্রঃ ওসায়িলুশ শিয়া, খন্ড ১, পৃষ্ঠাঃ ২৫৭)।

* অযুর নিয়ম সম্বন্ধে মহান আল্লাহতাআলা কোরআন শরীফে স্পষ্ট আকারে উল্লেখ করে দিয়েছেন যেমন, "হে মুমিনগন যখন তোমরা নামাযের জন্য উঠ, তখন স্বীয় মুখমন্ডল ও হস্ত সমূহ কুনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং তোমাদের মাথা মাসাহ্ কর এবং পদযুগল গিটসহ।" (সূত্রঃ আল কোরআন, সূরা মায়েদা, আয়াত: ৬, শুরা নং-৬; তাফসীরে ইবনে কাছীর - ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৪৪৬, সন ১৯৯১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)।

* মাথা ও পায়ের মাসাহ্ করতে হবে। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩৭৭, হাদীসঃ ৪২৪৭, আধুনিক প্রকাশনী)।

* মাথার অংশ বিশেষ মাসাহ্ করতে হবে। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১১৯, অনুচ্ছেদ, আধুনিক প্রকাশনী)।

* অযুতে প্রত্যেক অঙ্গকে দুইবার করে ধুইতে হবে। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃঃ ১১০, হাদীসঃ ১৫৪-১৫৫, আধুনিক প্রকাশনী ; সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, পৃঃ ১০৫, হাদীসঃ ১৬০, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)।

* কোরআনের আয়াত মতে “ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানু ইয়া কুম্‌তুম ইলাস সালাতি ফাগ্বসিলু উজুহাকুম ওয়া আইদিয়াকুম ইলাল মারাফিক্কি ওয়ামসাহু বিরুউসিকুম ওয়া আরজুলাকুম ইলাল কা’বাইনি” অর্থাৎ হে বিশ্বাস স্থাপনকারী যখন তোমরা সালাত বা নামাজের জন্য দাঁড়াও তখন তোমাদের মুখ মন্ডল ও তোমাদের উভয় হস্ত কুনুই পর্যন্ত ধৌতকর; এবং তোমাদের মাথা মাসাহ্ কর ও উভয় পায়ের গিরা পর্যন্ত । এখানে বলা হয়েছেঃ

ইয়া কুম্‌তু	- যখন তোমরা দাড়াইবে ।
আস সালাতি	- নামায, উপাসনা, প্রার্থনা যোগ সম্পর্কে ।
ফাগ্বসিলু	- তবে তোমরা ধৌত কর ।
উজুহাকুম	- তোমাদের মুখমন্ডল, তোমাদের চেহারা ।
ওয়া আইদীকুম	- এবং তোমাদের হস্ত সমূহ ।
ইলাল্ মারা ফিক্কি	- কুনুই সমূহ পর্যন্ত ।
ওয়া আমসাহু	- এবং তোমরা মাসাহ্ কর,
বিরুউসিকুম	- তোমাদের মস্তক বা মাথা ।
ওয়া আরজুলাকুম	- এবং তোমাদের পদযুগল,
ইলাল কা’বাইনি	- গোড়ালীদ্বয় পর্যন্ত ।

যেহেতু এখানে শুধু মাত্র একবার উল্লেখ রয়েছে **ফাগ্বসিলু** অর্থাৎ ধৌত কর । ফাগ্বসিলুর সাথে সম্পর্ক রয়েছে মুখমন্ডল, চেহারা, হস্ত সমূহ ও কুনুই সমূহ পর্যন্ত । এবং **ওয়া আমসাহুর** সাথে সম্পর্ক রয়েছে মাথা ও পায়ের গোড়ালীদ্বয় পর্যন্ত । এখানে মাথা ও পদযুগলকে মাসাহ্ করতে বলা হয়েছে, ধৌত নয় । যদি পাঁ-কে ধৌত করার কথা বলা হতো তাহলে ওয়া আরজুলাকুম শব্দটি ফাগ্বসিলুর সাথে যুক্ত হইত অথবা ওয়া আরজুলাকুমের পূর্বে ফাগ্বসিলু শব্দটি থাকতো । যেহেতু কোরআনে পাঁ-কে ধৌত করার কোন যুক্তি বা প্রমান নেই আছে মাসাহ্ করার তাই আমাদের সকলকে কোরআনের নিয়ম অনুযায়ী চলতে হবে । যদি প্রশ্ন উঠে যে পাঁয়ে নাপাকি থাকতে পারে তাই ধৌত করতে হবে । তাহলে তো আমাদেরকে মূল অযুর শুরুতেই পাঁ-কে ধুয়ে নিতে হবে কারন নাপাকি পাঁয়ে নিয়ে অযু কোন মতেই শুদ্ধ হবে না । পাঁ-কে ভালোমত ধুয়ে অযু শুরু করতে হবে । তারপর কোরআনের আয়াতমত মাসাহ্ করতে হবে ।

* কোরআনের আয়াতে পাঁ-কে ধৌত করার কোন আরবী শব্দ নেই পায়ের সাথে মাসাহ্ করার শব্দটি যুক্ত আছে। আর বিভিন্ন কোরআনের তাফসীরকারীরা এই আয়াতকে বিভিন্ন মত দিয়েছেন কেউ মাসাহ্ বলেছেন আবার কেউ ধুতে বলেছেন তাই মূল আরবী শব্দটি লক্ষ করলেই পূর্ণ জ্ঞান তলব করা যাইবে।

* "ইবনে মুসান্না (র) নিযাল ইবনে সাবূরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নিযাল ইবনে সাবূরা (রা) বলেনঃ একদা আমি দেখিলাম, আলী (আঃ) যোহরের নামায পড়িলেন। অতঃপর জনসমক্ষে বসিলেন। ইতিমধ্যে পনি নিয়া আসা হইলে তিনি মুখ ও হাত ধৌত করেন। ইহার পর তিনি মাথা এবং দুই পা মাসেহ করেন"। তাহলে এই হাদীস থেকে প্রমান পাওয়া যায় যে, হযরত আলী (আঃ)ও অযুতে পাঁ-কে মাসাহ্ করতেন। (সূত্রঃ তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩৭৪ সন ১৯৯১; পৃষ্ঠাঃ ৪৪৮ সন ২০০৫ (ই.ফা.বা)।

* 'আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেহ শৌচস্থান হইতে আসে অথবা তোমরা নারী-সম্ভোগ কর এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করিবে এবং মাসাহ্ করিবে মুখমন্ডল ও হাত, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল'। (সূরা নিসা, আয়াতঃ ৪৩)।

* যারা জানাবাত অবস্থায় থাকে তাদের জন্য গোসল করা আবশ্যক। বিশেষ এক পদ্ধতিতে শরীরকে ধৌত করার মাধ্যমে এ গোসল করতে হয়। আর যদি পানি না পাওয়া যায় কিংবা পানির ব্যবহার ক্ষতিকর হলে অথবা অযু গোসলের জন্য যথেষ্ট সময় হাতে না থাকলে তায়াম্মুম করতে হবে। সর্বাবস্থায় অযু সহকারে থাকা ভালো। এমনকি অযু সহকারে ঘুমানো সারা রাত ইবাদতের সমান সওয়াবের কাজ। এছাড়া অনেক ইবাদতমূলক কাজের জন্য যেমন দোয়া, যিয়ারত, কোরআন পাঠ এবং পড়ার সময়ে অযুতে থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর বিনা অযুতে কোরআনের আয়াত ও আল্লাহ, মহানবী (সাঃ) এবং ইমামগনের (আঃ) নাম স্পর্শ করতে বারণ করা হয়েছে। নামাযী ব্যক্তির শরীরকে ঢেকে রাখতে হবে। মানুষের জন্য উত্তম হলো নামাযে পরিস্কার, সাদা এবং সুগন্ধীযুক্ত কাপড় পরিধান করা। কেননা, সে

আল্লাহর সাক্ষাতে চলেছে। আর আদবের শর্ত হলো সর্বোত্তম কাপড় পরিধান করা।

তাহাজ্জুদ নামায প্রসঙ্গে

* আর রাতে তাহাজ্জুদ পড়ুন। এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত করণীয় কাজ। হয়তো আপনার রব আপনাকে মাকামে মাহমূদে পৌছিয়ে দেবেন। (সূরা বণী ইসরাঈলঃ আয়াত-৭৯)

* প্রিয়নবী (সাঃ) এবং তাঁর উম্মতদের জন্য তাহাজ্জুদ নামাযের যে নির্দেশটি আছে তা হল- আপনি নামাযে নিয়োজিত থাকুন রাত্রের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনও অর্ধেক, কখনও এক-তৃতীয়াংশ এবং আপনার সাথীদের একদলও। (সুত্রঃ সূরা মুয্যাম্মিল, আয়াতঃ ২০)।

* পবিত্র কোরআনের এ আয়াত থেকে বুঝা যায় তাহাজ্জুদের নামায প্রিয়নবী (সাঃ) এবং তার বিশেষ উম্মত তথা তাসাউফ বা মারেফাত পন্থীদের জন্য ফরজ বা অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য হিসেবে নির্দেশিত হয়েছে যার নূন্যতম সময় হচ্ছে রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ।

বেতর নামায প্রসঙ্গে

* তাহাজ্জুতের নামাযের সাথে এবং শেষে বেতর নামায আদায় করা এবং ঘুমানোর পূর্বে বিতর নামায পড়ার নির্দেশ। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৪১৫, হাদীসঃ ৯৩৩, আধুনিক প্রকাশনী)।

* ফজরের নামাযের পূর্বে যখন তাহাজ্জুত আদায় করা হয় দু'দু রাকাত করে তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক রাকাআত দিয়ে বিতর নামায পড়তেন। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৪১৬, হাদীসঃ ৯৩৬, আধুনিক প্রকাশনী)।

* রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেহরীর সময়ও বেতর নামায পড়তেন এবং সেহরীর সময় বেতর সমাপ্ত করতেন। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৪১৬, হাদীসঃ ৯৩৭, আধুনিক প্রকাশনী)।

আযান প্রসঙ্গে

* তুমি তোমার রবেব দিকে ডাক দাও। (সূরা কাসাস, আয়াত: ৮৭)।

* তুমি তোমার রবের পথের দিকে সুকৌশলে ও সদুপদেশের মাধ্যমে ডাক দাও। (সূরা নাহ্‌ল, আয়াত: ১২৫)

* আযান হলো একত্ববাদ ঘোষণার একটি মাধ্যম এবং মানুষদের নামাযের উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়ার আহবান। এটি ইসলামের একটি সুন্দর ও প্রভাব সম্পন্ন শ্লোগান।

* আযানের মধ্যে তাকবীর, তৌহিদ, রাসূলের রেসালাত ও আমিরুল মুমিনীনের বেলায়াতের প্রতি সাক্ষ্য এবং মানুষকে নামায ও কল্যাণের দিকে ধাবিত হওয়ার আহবান নিহিত রয়েছে।

* আযান হলো ইসলামের বিদ্যমানতার ঘোষণা আর মুসলমানদেরকে আহবান করা এবং দ্বীনি আকীদা বিশ্বাসকে পরিচয় করানোর প্রয়াস।

* আযান হলো ইসলামের নীরবতা ভেঙ্গে কাল্পনিক উপাস্যসমূহের বিরুদ্ধে জোরদার ধ্বনি আর ইসলামের স্বপক্ষে বলিষ্ট শ্লোগান ও আল্লাহর ধর্মের পক্ষে সমর্থন জ্ঞাপন। ‘পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের শুরুতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুস্তাহাব (মুস্তাহাবে মুয়াক্কাদা) হল আযান।’

* মহানবী (সাঃ) নামাযকে তাঁর নিজের চোখের মণি মনে করতেন। তিনি (সাঃ) বলেন, যে ব্যাক্তি আযানের ধ্বণি শুনতে পায় আর উপেক্ষা করে, সে অবিচার করলো। (সূত্রঃ নাহজুল ফাসাহা, ১৩২ নং বক্তব্য)।

* ইমাম খোমেনী (রহঃ) হতে বর্ণিতঃ নামায হলো সর্বোৎকৃষ্ট যিকির, এই শক্তিশালী দুর্গগুলোকে মজবুত করে আগলে রাখুন, এমন বলবেন না যে, আমরা তো বিপ্লব করেছি, এখন কেবল চিৎকার করবো। না, নামায পড়ুন, এটাই সব চিৎকারের উর্ধ্বে.....(সূত্রঃ সহীফায়ে নূর, খন্ড ১২, পৃষ্ঠাঃ ১৪৮-১৪৯)।

* ‘আমিরুল মোমেনীন হযরত আলী (আঃ) আল্লাহর একজন বাছাই করা বান্দা ছিলেন এবং শেষ নবীর পর তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে আল্লাহর পয়গামকে যথাযথ ভাবে পৌছানোর দ্বায়িত্ব আল্লাহ তার উপর অপর্ণ করে তাকে সম্মানিত করেছেন। প্রত্যেক নবীরই একজন ওয়াসি (খাস প্রতিনিধি) থাকেন। রাসূলুলাহ্ (সাঃ) এর ওয়াসি ছিলেন হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (আঃ)। আল্লাহ ও রাসূলের বাণী অনুযায়ি আমরা আলী (আঃ)কে সমস্ত সাহাবাদের মধ্যে অধিকতর মর্যাদা সম্পন্ন মনে করি। যেটা কোরআন ও হাদীসের বর্ণিত দলিলের সাথে সাথে আকলী (জ্ঞান দ্বার) দলিলের প্রমানিত। এবং এসব প্রমানাদি সন্দেহাতীত। কারন এগুলো আমাদের মতে যেমন সত্য ও নির্ভূল তেমন অন্যান্য মাজহাবের ধারা মতেও বিশুদ্ধ। আমাদের আলেমগন এই বিষয়ের উপর অসংখ গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেহেতু উমাইয়া বংশের খলিফাগণ এই সত্য চাপা দিতে এবং আলী ও আলে আলী (আঃ)কে হত্যা করে শেষ করে দিতে চাইতো তাই শেষ মেষ হযরত আলী (আঃ)এর উপর দোষ চাপিয়ে ও অভিসম্পাত করে মানুষের মন থেকে জোর জবরদস্থি করে তার নাম ও নিশানা মুছে ফেলতে চায়। বিধায় নিরুপায় হয়ে তার অনুসারীগণ আযানের সাথে ঘোষণা দিতে থাকে যে, আলী আল্লাহ্র ওয়ালী। আর কোন আল্লাহর ওয়ালীকে কোন মুসলমানের দোষারুপ করা জায়েয নয়। কাজটি তখন শুধু জালেম প্রশাসনের বিরূদ্ধে নিরুপায় হয়ে করতে হয়েছে যা আজ একটি উত্তম রেওয়াজে পরিনত হয়েছে । সম্মান যেহেতু আল্লাহ, তার রাসূল (সাঃ) ও মোমেনিনদের জন্য সংরক্ষিত। তাই এটা একটা ইতিহাসের অধ্যায়ের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে পরে যে, আলী ও তার দল সত্য পন্থি ছিলেন আর অন্যরা ছিল বাতিল। তাই ইসলামিক ইতিহাস পড়লে আমরা আরো বিস্তারিত তথ্য পাবো।

* ‘আলী (আঃ)কে ভালোবাসাই ঈমান, তার প্রতি বিরাগ নেফাক’ (সূত্রঃ মুসলেম শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৬১; মানান নেসাই, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১১৭; সহী তিরমিজি, ৮ম খন্ড)

* ‘মাবিয়া উমাইয়া খলিফা। উমাইয়াদের সম্পর্কে কিছু পূর্বেও উলেখ করা হয়েছে। উমাইয়া বংশের রাজত্বকালে হযরত আলী (আঃ) এর প্রতি

জনগনকে বিরূপ করে তোলার জন্য জুম্মা ও ঈদের নামাযের খোৎবাতে হযরত আলীকে গালমন্দ করা হত। কুৎসা রটানো হত। এ অপ্রপয়াস হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ এর খলিফা হওয়ার আগ পর্যন্ত চলতে থাকে তিনি খলিফা হয়ে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এবং হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজের মৃত্যুর পর আবার আলে রাসূলের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানোর প্রবনতা মাথা চারা দিয়ে উঠে। তখন যারা হযরত আলীর অনুসারী ছিলেন (শিয়া) তারা শাসক গোষ্ঠির অপপ্রচারের মোকাবেলায় কালেমাতে অংশ যোগ করে। এবং হযরত আলী যে অভিশপ্ত নন বরং আলাহর ওয়ালী ও নবীর ওয়াসি, তারা এটা খোলাখুলি ভাবে প্রচার করেন। এমন কি আযানের শব্দ রাজির মধ্যেও তা বলতে থাকেন। এই সংযোজিত অংশ সম্পর্কে তাদের ফিকাহ্র কিতাবে বলা হয়েছে যে, "আশহাদু আন্না আলীয়্যান ওয়ালী উল্লাহ" অর্থাৎ- আমি সাক্ষ দিতেছি যে, আলী আল্লাহর ওয়ালী। এই শব্দাংশ যদিও আযানের ও একামতের অংশ নয় তবে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলার পর ইহা বলা মুস্তাহাব। (সূত্রঃ তিরমিজি শরীফ, ২১৪/২; তওযী হুল মাসায়েের, পৃষ্ঠাঃ ১০৪)

* এই বর্ধিত অংশের জন্য শিয়া মুজতাহিদ আল্লামা আক্কাই মুহসিন বলেন, এই অংশটুকু আযানের অংশ নয় কিন্তু ইহা মুস্তাহাব হওয়ার নিয়তে বলা হয়। (সূত্রঃ তাহফাতুল আওয়াম, পৃষ্ঠাঃ ১১৯)

* 'মাবিয়া যখন খেলাফত লাভ করে তখন তারা খোৎবায় পর্যন্ত হযরত আলী (আঃ)কে গালি দিত কুৎসা রটাতো এবং যাহারা এই কুৎসা রটানোকে অস্বীকার করতো মাবিয়া তাদের উপর যুলুম করতো। কিন্তু রেওয়ায়াতে হযরত উম্মুল মুমেনিন উম্মে সালমা (রাঃ) হইতে বর্ণিত রাসূলে খোদা (সাঃ) বলেছেন- "যে কেহ আলী (আঃ) কে গালি দেয়, নিশ্চয়ই সে আমাকে গালি দেয়।" (সূত্রঃ মিশকাত শরীফ কিতাবুল ফিতনের 'আলমানাকিব' অধ্যায়, পৃষ্ঠাঃ ৫৬৫; আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রাঃ) ইহা রেওয়াত করিয়াছেন)।

* খোদা বলছেন "হে মুমিনগণ আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।" (আল কোরআনঃ- সুরা আহযাব-আয়াতঃ৭০)

* ওহে ঈমানদারগন " তোমাদের মালিক ও অবিভাবকতো কেবল ইহারাই- খোদা ও তাঁহার রাসূল (সাঃ) এবং মোমেনিন যে নিয়মিত ও রীতিমত নামায আদায় করিয়া থাকেন এবং রুকুতে থাকিয়াই যাকাত আদায় করেন। (সুত্রঃ আল কোরআনঃ সূরা মায়েদাঃ আয়াতঃ ৫৫)।

* সহীহ হাদীস থেকে একটু বিস্তারিত জেনে দেখুন রুকু কালীন সময় যাকাত প্রদানকারী এই মহান ব্যক্তিটি কে? (সুত্রঃ তাফসীরে তাবারী ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ১৬৫; তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২য় খন্ড, পৃঃ ৭১; সাওয়ায়েকে মুহরেকা, পৃঃ ২৫; আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৭ম খন্ড, পৃঃ ৩৫৭; আল গাদীর, ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৫৬ ও ১৬২)।

* হে মুমিনগন! যদি তোমরা আল্লাহর ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা অনুগত্য কর আল্লাহর, অনুগত্য কর রাসূলের এবং তাহাদের যাহারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতাবান অধিকারী। (সূত্রঃ আল কোরআন, সূরা নিসা, আয়াতঃ ৫৯)।

* আর কখনো সাক্ষ্য গোপন করবে না। যে সাক্ষ গোপন করে তার মন গুনাহে লিপ্ত। আল্লাহ তোমাদের আমল সম্বন্ধে জানেন। (সূত্রঃ আল কোরআন, সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ২৮৩)।

* আর এভাবে আমি আপনাদিগকে মনোনীত করেছি মানবজাতির সাক্ষ্যদাতারূপে আর রাসূল হলেন আপনাদের উপর সাক্ষদাতা। (সুত্রঃ আল কোরআনঃ সূরা বাকারা- আয়াতঃ ১৪৩)।

* তাফসিরে আয়াসীতে ইমাম মুহাম্মদ বাকের ও ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বলেছেন যে দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমরা মানবজাতির উপর সাক্ষ্যদাতা ও তাঁর (আল্লাহ্‌র) প্রমাণস্বরূপ আছি। (সূত্রঃ তাফসীরে কুম্মী ১ম খন্ড পৃঃ ৬২)।

* আযানে আলিয়ান ওলিউল্লাহ্ প্রসঙ্গে। (সূত্রঃ নবী বংশ পরিচিতি, পৃষ্ঠাঃ ১৪৪)।

* হযরত আলী (আঃ)এর অনুসারীরা (শিয়া) সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়; কুরআন শরীফ আল্লাহরই অলিখিত বাণী এবং ত্রানের নিমিত্তে আল্লাহ তাঁহার জ্যোতির আংশিক অধিকারী হিসাবে একজন ইমাম নিজুক্ত করেন। শিয়াগন কালেমা তাইয়েব 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কোন উপাস্য নাই এবং মুহাম্মদ আলাহর প্রতিনিধি)-এর সঙ্গে আলী খলিফাতুল্লাহ (আলী আল্লাহর প্রতিনিধি) কথাটি যোগ করেন। (সূত্রঃ ইসলামের ইতিহাস, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্নাতক শ্রেনীর সর্বাধুনিক তথ্যসম্বলিত পাঠ, ডাঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, পৃষ্ঠাঃ ৬৪৪)।

* সিফফীন যুদ্ধে মরুভূমিতে গির্জার সন্ন্যাসী হযরত আলীর অবস্থা প্রতক্ষ্য করে গির্জা থেকে নিচে নেমে এসে এবং হযরত আলীর (আঃ)এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলঃ আপনি কি প্রেরিত পয়গম্বর? হযরত আলী বললেনঃ না। সে বললঃ আপনি কি কোন নৈকট্যশীল ফেরেশতা? তিনি বললেন না। সন্ন্যাসী প্রশ্ন করলঃ তাহলে আপনি কে? হযরত আলী (আঃ) বললেনঃ আমি মহানবী মোহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) খলিফা বা প্রতিনিধি। সন্ন্যাসী বললঃ হাত বাড়ান। আমি আপনার হাতে ইসলাম কুবুল করব। হযরত আলী (আঃ) তার দিকে হাত প্রসারিত করলে সে বললঃ "আমি সাক্ষ্য দেই যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মোহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে আপনি আলী রাসূলুল্লাহর প্রতিনিধি। (সূত্রঃ শাওয়াহেদুন্ নবুওত, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মদীনা পাবলিকেশন্স, পৃষ্ঠাঃ ২১৯-২২০)।

* খোদা কোরআনে বলছেন: "আমার বান্দাদীগকে যাহা উত্তম তাহা বলিতে বল। শয়তান উহাদিগের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উসকানি দেয়। শয়তান মনুষের প্রকাশ্য শত্রু।" (সুরা বাকারা, আয়াত: ২০৮; সুরা বাণী ঈসরাইল, আয়াত: ৫৩)।

* “অতএব তাহাদিগের কথায় তোমাকে যেন দুঃখ না দেয়। আমি তা জানি যাহা তাহারা গোপন করে এবং যাহা তাহারা ব্যক্ত করে।” (আল কোরআন:- সুরা ইয়াসিন-আয়াত:৭৬)

আযানে অতিরিক্ত শব্দ যুক্ত প্রসঙ্গে

* আযান বৃদ্ধি করা হয়েছে যাহা নবী (সাঃ), আবু বকর, ওমর এর খেলাফতের সময় ছিল না, কিন্তু ওসমানের খেলাফতের সময় হয়েছে। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩৮৭, হাদীসঃ ৮৫৯-৮৬৩, আধুনিক প্রকাশনী)।

* ফজরের আযানে ‘আস্ সালাতু খাইরুম মিনান্নাউম’ বাক্যটিকে উমর ইবনে খাত্তাব ফজরের আযানের অন্তর্ভুক্ত করিবার নির্দেশ দিলেন। (সূত্রঃ মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র), ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১০১, রেওয়ায়তঃ ১৯৬)।

* ইয়াহ্ ইয়াও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইয়াহ্ইয়া বলেছেনঃ কোন কোন ভাই আমার কাছে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, মুয়ায্যীন যখন ‘হাইয়্যা আলাস্ সালাহ্’ বলেছে, তখন মাবিয়া ‘লা-হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ্’ বলেছেন এবং তিনি বলেছেন, আমি তোমাদের নবী (সাঃ)-কে এভাবে বলতে শুনেছি। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ২৮০, হাদীসঃ ৫৭৮)।

নামাযের সামনে দিয়ে চলা প্রসঙ্গে

* নামাযের সামনে দিয়ে চলে গেলে নামায নষ্ট হয় না। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৭৫, হাদীসঃ ৭৬, ৮১২, ৪৬৩, আধুনিক প্রকাশনী)।

* নামাযের সামনে দিয়া চলাচল করলে, তাহাতে নামায নষ্ট হয় না। (সূত্রঃ মুয়াত্তা ইমাম মালেক (র), ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৬৮, হাদীসঃ ৪৫০-৪৫৪)। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)।

সিজদার সময় হাত মাটিতে বিছানো প্রসঙ্গে

* সিজদার সময় মাটিতে হাত বিছিয়ে না দেয়া (যেমন আমাদের দেশের মহিলাগণ করে থাকেন। (সূত্রঃ সহীহ্ আল বুখারী, ১ম খন্ড, হাঃ ৭৭৬; মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আযমী- ২য় খন্ড, হাঃ ৮২৮; বুখারী শরীফ (ইফাবা) ২য় খন্ড, হাঃ ৯৮৩, ৯৮৪; তিরমিযী (ইফাবা) ১ম খন্ড, হাঃ ২৭৫)।

তারাবীহ্ নামায প্রসঙ্গে

* তারাবীর নামায রাসূলুলাহ্ (সাঃ)-এর সুন্নাত কিনা-তা নিয়ে মতভেদ আছে। আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্ আবু যর গিফারি (রাঃ)এর সূত্রে রমযানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নফল নামায সম্পর্কে হাদীস উল্লেখ করেছেন। তাতে আবু যর (রাঃ) বলেন, আমরা রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে রোযা রেখেছি। কিন্তু আমাদের সাথে নিয়ে তিনি এমাসে নফল নামায পড়ার রীতি চালু করেননি। তবে মাসের সাতদিন বাকি থাকতে তিনি এসে আমাদের সাথে নফল নামায পড়তে শুরু করলেন। তাও চারদিন পড়িয়ে তিনি আর এ নামায পড়াননি।

* বুখারি ও মুসলিমে যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে মাদুরের হুজরায় থাকতে শুরু করলেন (অর্থাৎ রমযানের শেষ দশদিন ই'তেকাফের উদ্দেশ্যে)। সেখানে তিনি কয়েক রাত্রি (নফল) নামায পড়লেন। এমনকি লোকেরাও তাঁর সাথে নামায পড়তে শুরু করলো। অতপর একদিন লোকেরা তাঁর কোনো সাড়া শব্দ পেলনা। তারা ভাবলো, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাই কেউ কেউ গলা খাকরাতে শুরু করলো, যাতে করে তিনি তাদের কাছে বেরিয়ে আসেন। তাদের অবস্থা লক্ষ্য করে তিনি বলে উঠলেন: “এই নামাযের ব্যাপারে আমি তোমাদের তৎপরতা লক্ষ্য করেছি। আমার আশংকা হয়, এই নামায তোমাদের উপর ফরয হয়ে না পরে। যদি ফরয হয়ে যায়, তবে তোমরা তা পালন করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা এ নামায ঘরে পড়ো। কারণ, ফরয নামায ছাড়া অন্য নামায ঘরে পড়াই উত্তম।” (সূত্রঃ আল্লাহ্র রাসূল কিভাবে নামায পড়তেন, পৃষ্ঠা: ১৭৬, আলামা হাফিয ইবনুল কায়্যিম, আবদুস শহীদ নাসিম অনূদিত)।

* সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রমযানের রাতে নামায পড়ার জন্যে আমাদের উৎসাহ দিতেন। তবে এ ব্যাপারে আমাদের খুব তাকিদ করতেন না। তিনি বলতেনঃ 'যে ব্যক্তি ঈমান ও আশা নিয়ে রমযান মাসে নামাযে দাঁড়াবে তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।' অতপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ওফাত লাভ করেন এবং এ ব্যাপারে অবস্থা একই রকম থাকে। আবু বকর এর খেলাফতকালে একই অবস্থা থাকে (অর্থাৎঃ তারাবীর জামায়াত কায়েম হতোনা। কেউ পড়লে ব্যক্তিগতভাবে পড়তো) উমর এর খিলাফতের প্রথম দিকেও একই অবস্থা থাকে। (সূত্রঃ আল্লাহ্‌র রাসূল কিভাবে নামায পড়তেন, পৃষ্ঠাঃ ১৭৬, আল্লামা হাফিয ইবনুল কায়্যিম, আবদুস শহীদ নাসিম অনূদিত)।

* সহীহ বুখারীতে আবদুর রহমান বিন আবদুল কারী থেকে বর্ণিত হয়েছে, এক রাত্রে আমি (খলিফা) হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে বেরিয়ে মসজিদের দিকে এলাম। আমরা এসে দেখি, লোকেরা মসজিদে ভাগে ভাগে নামায পড়ছে। কেউ নিজের নামায নিজে পড়ছে, আবার কারো কারো সাথে কয়েকজন একত্র হয়ে পড়ছে। এ অবস্থা দেখে উমর (রাঃ) বললেনঃ আমি যদি এই সবাইকে একজন ইমামের পিছে একত্র করে দিই, তবে তো উত্তম হয়। অতপর এ বিষয়ে তিনি মনস্থির করেন এবং সবাইকে উবাই ইবনে কা'আবের পিছনে একত্র করে দেন। আবদুর রহমান বলেনঃ এরপর আরেক রাত্রে আমি হযরত উমরের সাথে বেরুলাম। আমরা দেখলাম, লোকেরা তাদের কারীর পেছনে নামায পড়ছে। এ অবস্থা দেখে হযরত উমর বলে উঠলেন এটা একটা উত্তম বিদআত (নতুন নিয়ম)। তিনি লোকদের বললেনঃ রাতের সেইভাগ অর্থাৎ তাঁর মতে শেষ ভাগ যাতে মানুষ ঘুমায় তার চাইতে উত্তম রাতে মানুষ দাঁড়ায়। আর মানুষ রাতের প্রথম ভাগেই দাঁড়িয়ে থাকে। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ২৫৯, হাদীসঃ ১৮৬৮)।

* মু'আত্তায়ে মালিক-এ সায়েব ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেনঃ খলিফা উমর উবাই ইবনে কাআবের এবং তামীমদারীকে রমযান মাসে লোকদেরকে এগারো রাকাত (বিতরসহ) নামায পড়াতে নির্দেশ প্রদান করেন। অতএব ইমাম শত আয়াতের কিরাত দিয়ে আমাদের নামায

পড়াতেন। এতো লম্বা কিয়ামের কারণে আমরা শেষ পর্যন্ত লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হই। ফজরের কাছাকাছি সময় আমরা এ নামায থেকে ফারেগ পেতাম। (সূত্রঃ মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র), প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৩৭, হাদীসঃ ৩১৮)।

* সহীহ আল বুখারীর হাদীস অনুযায়ী রাসূল (সাঃ)-এর সময়ে ইহার কোন প্রচলন ছিলো না। হযরত ওমর তারাবীহ-কে অনুষ্ঠান ও অনুশীলনের মাধ্যমে প্রচলন করে গেছেন। এবং হযরত ওমর নিজেও কখনো তারাবীহ নামাযকে আদায় করেছেন কিনা তার কোন প্রমান নেই। কারন দ্বিতীয় রাত্রে যখন তিনি বের হন তখন তিনি দেখলেন সকলে নামাযরত অবস্থায়, আর তিনি পেছন থেকে আব্দুর রহমানের সাথে এই নামায সম্বন্ধে কথা বলছিলেন।

* (তারাবির নামায) মহানবী (সাঃ)-এর অনুসরণে আদায় করা মুস্তাহাবে মুয়াক্কাদাহ বলে পরিগণিত। শিয়াদের ফিকাহ মোতাবেক রমযান মাসের রাতগুলোতে মোট এক হাজার রাকাত নামায পড়া মুস্তাহাব, কিন্তু এ নামাযগুলো জামায়াতে আদায় করা বেদআত। অবশ্যই এ নামাযগুলো একাকী (ফোরাদা) মসজিদে এবং অধিকাংশ সময়ে গৃহে আদায় করতে হবে। যায়েদ ইবনে সাবেত মহানবী (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, কোনো ব্যক্তির জন্যে গৃহে নামায পড়া মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। যদি না তা ওয়াজিব নামায হয় কেননা ওয়াজিব নামাযগুলো মসজিদে আদায় করা মুস্ত াহাব। (সূত্রঃ তুসী, খেলাফ কিতাবুস সালাত, মাসয়ালা-২৬৮)।

* ইমাম বাকের (আঃ) বলেন, মুস্তাহাব নামাযগুলোকে জামায়াতে পড়া যাবে না এবং দ্বীনের ক্ষেত্রে যে কোনো প্রকার বিদআতই পথভ্রষ্টতা যার পরিণতি হলো আগুন। (সূত্রঃ সাদুক খেসাল ২/১৫২)।

* ইমাম রেজা (আঃ) ও স্বীয় রেসালা যা একজন মুসলমানের আকাইদ ও আমল' শিরোনামে লেখা হয়েছে, তাতে উল্লেখ করেছেন যে, মুস্তাহাব নামাযগুলোকে জামায়াতে পড়া যায় না এবং এমনটি করা হল বিদআত। (সূত্রঃ সাদুক, উয়ুনে আখবারে রেজা (আঃ), খন্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ১২৪)।

* জামায়াতবদ্ধ হয়ে তারাবীর নামায আদায় করার ব্যাপারটি (যা আহলে সুন্নতের ও অন্যান্য মাজহাবের মধ্যে প্রচলিত) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ব্যক্তিগত মতের (ইজতেহাদ বে রায়) মাধ্যমে বৈধতা দান করা হয়েছে। আর তাই একে বিদআতে হাসানা (বা সুন্দর বেদআত) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (সূত্রঃ কাসতালীনী এরশাদুস সারী ৩/২২৬, আইন উমদাতুল কারী ১১০/১২৬ শাতেবী, আল এ'তেসাম ২/২৯১; গ্রন্থস্বত্যঃ ইমামিয়া বিশ্বাসের সনদ- পৃষ্ঠাঃ ২৩২)।

* জারির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি দুটি উটের পিঠে পানি বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন রাতের অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে এসেছিল। এই সময় সে মু'আযকে নামাযে রত দেখতে পেয়ে উট দুটি বসিয়ে মু'আযের সাথে নামাযে শামিল হল। তিনি নামাযে সূরা বাকারাহ অথবা নিসা পাঠ করতে থাকলে লোকটি (বিরক্ত হয়ে নামায ছেড়ে) চলে গেল। পরে সে জানতে পারল, তার এ কাজে মু'আয মনক্ষুন্ন বা দুঃখিত হয়েছে। সুতরাং সে নবী (সাঃ)-এর নিকট গিয়ে মু'আযের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে নবী (সাঃ) তাকে তিনবার বললেন, হে মু'আয! তুমি কি ফেতনা সৃষ্টিকারী (হিসেবে গণ্য হতে চাও)? তুমি সাব্বিহিস্‌মা রাব্বি আল-আলা, ওয়াশশামসি ও দুহাহা কিংবা ওয়াল্‌ -লাইলে ইযা ইয়াগ্‌শার্‌ মত সূরা পাঠ করে নামায আদায় করলে কতই না উত্তম হত। কেননা তোমার পিছনে বৃদ্ধ, দূর্বল ও (জরুরী) প্রয়োজনে ব্যস্ত (সব রকমের) লোকই নামায আদায় করে থাকে। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩০৯-অনুচ্ছেদ, হাদীসঃ ৬৬২-৬৬৩)।

* আলাহ্‌ তায়ালা বলছেনঃ 'এখন থেকে (নামাযে কোরআন) ততটুকুই পড়, যতটুকু তোমরা সহজে পড়তে পার। আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের কতক লোক অসুস্থ থাকে অণ্য কতক লোক আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করার জন্য সফর করে থাকে, আরো কতক লোক আল্লাহর পথে লড়াই করে। তাই কোরআনের যতটুকু সহজে পড়া যায় ততটুকুই পড়ে নাও। (সুত্রঃ আল কোরআন, সূরা মুয্‌যাম্‌মিল, আয়াতঃ ২০, শুরা নংঃ ৭৩, অধ্যাপক গোলাম আযম অনুবাদিত)।

* আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূললুল্লাহ (সাঃ) বলেন তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ যখন ইমামতী করবে, তখন যেন সে স্বল্প কেরায়াত করে। কেননা জামাআতে দূর্বল, বৃদ্ধ ও প্রয়োজনে ব্যস্ত লোকও থাকে। কিন্তু তোমরা কেউ একাকী নামায আদায় করলে যতটা ইচ্ছা কেরাআত দীর্ঘ করতে পার। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩০৯, হাদীসঃ ৬৫৯-৬৬৪)।
* আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সাঃ) নামায সংক্ষিপ্ত করতেন, তবে পূর্ণাঙ্গ করে আদায় করতেন। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩১০-অনুচ্ছেদ, হাদীসঃ ৬৬৪, আধুনিক প্রকাশনী)।

* সহীহ আল বুখারীর মতে ইবাদতে কঠোরতা অবলম্বন মাকরূহ। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ২৪৪, অনুচ্ছেদ, আধুনিক প্রকাশনী)।
* আল্লাহ্ বলছেনঃ "বস্তুতঃ তাঁরা যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন অত্যন্ত আলস্যের সঙ্গে দাঁড়ায়, মানুষকে দেখাবার জন্য অন্তর তাদের আল্লাহকে স্মরণ করে না। (সূত্রঃ আল কোরআন, সূরা নিসাঃ আয়াতঃ ১৪২, শুরা নংঃ ৪)।

* প্রত্যেক বিদ-আতই ভ্রষ্টতা। (সূত্রঃ সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া, পৃষ্ঠাঃ ১১৬, এমদাদিয়া লাইব্রেরী)।

* আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সাঃ) বলেছেন, আমি হাউযে কাউসারে তোমাদের অগ্রগ্রামী প্রতিনিধি হবো, তোমাদের মধ্যে কিছু লোককে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে, আর যখন আমি তাদেরকে পান করাতে উদ্যত হবো, তখন আমার থেকে তাদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, আমি বলবো হে পরোয়ারদিগার! এরা তো আমার সাহাবী (উম্মত,) তিনি বলবেন, আপনি জানেন না তারা আপনার পর-নতুন (বিদআত) কি করেছে। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, (আধুনিক) ৬ষ্ঠ খন্ড, হাদীসঃ ৬৫৬০, পৃষ্ঠাঃ ৩১৩)।

* আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাঃ) বলেনঃ ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা ব্যাপক হওয়ার পূর্বেই নেক কাজ করার জন্য এগিয়ে আসার প্রতি উৎসাহ প্রদান করো। কারণ মানুষ তার দুনিয়ার সামান্যতম স্বার্থের বিনিময়ে নিজের দ্বীনকে বিকিয়ে দিবে। (সূত্রঃ সহীহ মুসলিম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ২০৭, হাদীসঃ ২২১, (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার)।

* আম্র ইবনে যুরার (র) যুহরী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন সালাতকেও নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। (সূত্রঃ বুখারী শরীফ, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), ২য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৮, হাদীসঃ ৫০৪ - ৫০৫)।
* রাসূলের সহচর, সাহাবী (উম্মত) ও সাথীগনরা রাসূলের পর নতুন (বিদআত) উদ্ভাবন করেছে। (সূত্রঃ মুসলীম শরীফ, (ই.ফা.বা) ষষ্ঠ খন্ড, হাদীসঃ ৫৭৭৬, পৃষ্ঠাঃ ৩১১; মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৭, হাদীসঃ ১৩৭৭, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)।

দরূদ শরীফ প্রসঙ্গে

* আল্লাহ এরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ "অবশ্যই আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের নিয়ে নবীর প্রতি দরূদ পাঠ করেন। হে ঈমানদারগন তোমরাও তাঁর প্রতি (রাসূল সাঃ) দরূদ ও সালাম পাঠ করতে থাকো। (সূরা আহযাব - আয়াতঃ ৫৬।

* এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আপনার উপর কিভাবে দরুদ পাঠ করতে হবে? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন তোমরা যেন আমার উপর লেজ কাটা দরূদ না পড়। যেমন 'আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদ' এই বলে থেমে যেও না। তোমাদের উচিত আমার সাথে আমার আহলে বায়েত (আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন) এদের উপরেও দরূদ পাঠ করা। যেমনঃ **"আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলে মুহাম্মাদ"**। আমার 'আল্‌কে' অবশ্যই সংস্পৃক্ত করতে হবে। (সূত্রঃ জাজবায়ে বেলায়েত পৃষ্ঠাঃ ১৫৪; মাজমাউল বয়ান, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩৬৯; মুরাজেয়াত, পৃষ্ঠাঃ ৬৬; মাসনাদে আহমাদ, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩৫৩, ইয়া নাবিউল মাওয়াদ্দাত, পৃষ্ঠাঃ ৭; কানযুল উম্মাল, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১২৪; সাওয়ায়েকে মুহরেকা পৃঃ ৮৭; ফাজায়েলুল খামছা, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ২০৯; যাখাইরুল উকরা, পৃষ্ঠাঃ ১৯)।

* ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম তাঁর 'জামউল ইফহাম' গ্রন্থে 'সালাত' এর অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমাদের দেশে রাসূল (সাঃ) এর উপর সালাত পাঠ করাকে 'দরূদ' বলা হয়। এটা ফার্সি শব্দ। রাসূল (সাঃ) উপর সালাত পাঠানোর জন্যে দু'আ করা মানে তার জন্যে রহমতের

দু'আ করা। আবুল আলিয়্যা (র) বলেছেন, রাসূল (সাঃ) এর উপর সালাত পাঠানোর জন্যে দু'আ করা মানে তাঁর সম্মান, মর্যাদা ও প্রশংসা বাড়িয়ে দেবার জন্যে দু'আ করা। (সূত্রঃ মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৭৭; আল্লাহ্‌র রাসূল কিভাবে নামায পড়তেন, পৃষ্ঠাঃ ৬৯)।

* ফুযালা ইবনে উবায়েদ থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে, সে যেনো আল্লাহর প্রশংসা ও মহত্ত্ব বর্ণনা করে এবং তাঁর নবীর উপর সালাত (দরূদ) পাঠ করে। অতপর যেনো সে ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোনো দু'আ করে। ইমাম তিরমিযি এটিকে সহীহ হাদীস বলেছেন। (সূত্রঃ মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী এবং আবু দাউদ)।

* এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফায়ী (রহঃ) বলেন, ইয়া! আহ্‌লে বায়েতে রাসূল! আপনাদের মুয়াদ্দাত (প্রাণাধিক ভালোবাসা ও অনুসরণ) পবিত্র কোরআনে ফরজ করা হয়েছে। "যে ব্যাক্তি নামাযে আহলেবায়তের উপর দরূদ (অথাৎ- **"আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলে মুহাম্মাদ")** না পড়বে তার নামায নামাযই নয়। (সূত্রঃ ইবনে হাজার মাক্কীর- সাওয়ায়েকে মুহরেকা, পৃষ্ঠাঃ ৮৮; ইমাম গাজ্জালী (রাঃ) তার এহিয়াউল উলুমের, ১ম খন্ডে উল্লেখ করেছেন)।

* নামাযের শেষে দরূদ পাঠ করা হয়। (সূত্রঃ দরূদ শরীফের ফজিলত ও মহাত্মা, মাওলানা আমিনুল ইসলাম সাহেব, পৃঃ ৫)।

* তাছাড়া কোরআনে ইয়াসিন ও আলে ইয়াসিনের উপর দুরূদ ও সালাম পাঠানোর কথা উল্লেখ আছে। আর কোরআনে রাসূল (সাঃ)-কে আরো পাঁচটি নামে ডাকা হলঃ (১) মোহাম্মদ (২) আহমাদ (৩) আবদুল্লাহ (৪) ইয়াসিন ও (৫) নূন। (সূত্রঃ আল কোরআন, সূরা সাফফাত, আয়াতঃ ১৩০)।

* উল্লেখিত দরূদটি নবী করিম (সাঃ) কতৃক বর্ণিত ও সর্বজন স্বীকৃত। এই দরূদ নবী (সাঃ) ও তাঁর আহলে বায়েত ছাড়া আর কেহই অন্তর্ভূক্ত হয়নি এবং তা সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত এভাবেই পঠিত হয়ে আসছে। কিন্তু অধুনা বেশ কিছু সংখ্যাক কিতাবাদি ও আলেম উলেমাগন এই দরূদের সাথে আরো কতিপয় শব্দ যোগ করে পাঠ করে থাকেন। এটা নবীজির শিক্ষার বিপরীত নয় কি?

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যাহা শিক্ষা দান করেননি তাঁকে ইসলামের ভাষায় বেদাআত বলা হয়। আর প্রত্যেক বেদআতই ভ্রষ্টতা। তাই আমাদের সকলকে কোরআনের সাথে যে সহীহ হাদীসের সম্পর্ক সেই হাদীসগুলো সংগ্রহ করে তার উপর আমল করতে হবে।

রুকু প্রসঙ্গে

* নিশ্চিত সফল হয়েছে সেসব মুমিন, যারা তাদের নামাযে বিনয় ও একাগ্রতা অবলম্বন করে। (সূরা মু'মিনূন: ১-২)।

* যখন তাদের বিনত হবার জন্য বলা হয় তখন তারা বিনত হয় না। (সুত্রঃ আল কোরআন, সূরা মুরসালাতঃ আয়াতঃ ৪৮)।

* স্মরণ রাখতে হবে যে, রুকু হলো স্রষ্টার মহীমার সম্মুখে অবনত হওয়া। আর আমাদের সিজদা হলো বিশ্বচরাচরের সাথে একত্মতা প্রকাশ যারা আল্লাহর দরবারে আত্মসমর্পিত, বিনত এবং আনুগত্যশীল।

* হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সহচরদের পরিচয় বর্ণনায় পবিত্র কোরআনে এসেছেঃ তাদেরকে দেখবে রুকু ও সিজদা অবস্থায় আল্লাহর নিকট থেকে অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অন্বেষন করে তাদের পরিচয় হলো তাদের মুখমন্ডলে সিজদার চিহ্ন বিদ্যমান। (সূরা ফাত্হঃ আয়াতঃ ২৯, শুরা নংঃ ৪৮)।

* মহানবী (সাঃ) এমন দীর্ঘ রুকু করতেন যে ঘাম তার পদযুগল বেয়ে গড়িয়ে পড়ত। (সূত্রঃ বিহরুল আনোয়ার, খন্ডঃ ৭, পৃষ্ঠাঃ ৮২)।

* হযরত আলী (আঃ) এমন দীর্ঘ রুকু করতেন যে ঘাম তার পদযুগল বেয়ে গড়িয়ে পড়ত। (সূত্রঃ বিহরুল আনোয়ার, খন্ডঃ ৭, পৃষ্ঠাঃ ৮২)।
* তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁহার রাসূল ও মু'মিনগণ যাহারা সালাত কায়েম করে ও রুকুর অবস্থায় যাকাত দেয়। (সুত্রঃ আল কোরআন, সুরা মায়েদা, আয়াতঃ ৫৫)।

* হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেনঃ একদিন আমি আল্লাহ্‌র রাসূলের (সাঃ) সঙ্গে মসজিদে যোহরের নামায পড়িলাম। একজন ভিক্ষুক মসজিদে আসিয়া ভিক্ষা চাহিল। কেহ তাহাকে কিছুই দিল না। ঐ ভিক্ষুক তাহার দুই হাত আকাশের দিকে উত্তোলন করিয়া বলিলঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার পয়গাম্বরের মসজিদে আসিয়া ভিক্ষা চাহিলাম, কিন্তু কেহ আমাকে কিছুই দিল না। এই সময় হযরত আলী (আঃ) রুকুর অবস্থায় ছিলেন। নিজের আঙ্গুলের ইশারায় ভিক্ষুককে ইঙ্গিত করিলেন। হযরত আলী (আঃ)-এর ডান হাতের আঙ্গুলে আংটি ছিল। ভিক্ষুকটি অগ্রসর হইয়া হযরত আলী (আঃ)-এর আঙ্গুলের আংটি খুলিয়া নিল। আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) এই ঘটনা দেখিয়া নিজের মাথা আকাশের দিকে করিয়া বলিলেনঃ হে আল্লাহ! হযরত মূসা আপনার কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, হে খোদা আমার বক্ষ প্রসারিত করিয়া দাও আর আমার কাজ আমার জন্য সহজ করিয়া দাও এবং আমার জিহ্‌বার জড়তা ও বন্ধন খুলিয়া দাও যেন লোকেরা আমার কথা বুঝিতে পারে। আর আমার বংশ হইতে আমার ভাই হারুন (আঃ)-কে সাহায্যকারী করিয়া দাও, যেন সে আমার শক্তিকে দৃঢ় করে। আমার কাজে তাহাকে আমার সঙ্গী করিয়া দাও। আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মূসা (আঃ)-কে বলিলেন, আমি তোমার ভাই দ্বারা তোমার শক্তিকে দৃঢ় করিয়া দিলাম। তোমাকে রাজত্ব প্রদান করিলাম কোন এমন নিদর্শন নাই যাহা তোমার কাছে নাই। হে আল্লাহ্‌তায়ালা! আমি মুহাম্মদ তোমার প্রিয় রাসূল। হে আল্লাহ আমার বক্ষকে প্রসারিত করুন, আমার কাজ সহজ করুন এবং আমার বংশধরদের আমার সাহায্যকারী নিযুক্ত করুন। আমার পৃষ্ঠকে আলী দ্বারা শক্তিশালী করুন। হযরত আবু যার গিফারী বলিলেন যে, আল্লাহ্‌র রাসূলের কথা তখনো শেষ হয় নাই, এমতাবস্থায় হযরত জিব্রাইল (আঃ) এই আয়াতে পাক নিয়ে হজুর (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। (সূত্রঃ তাফসীরে ইবনে কাছীর, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৭১; তাফসীরে তাবারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৬৫; তাফসীরে রাজি, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৪৩১; তাফসীরে খাজিন, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৪৯৬; তাফসীরে আবুল বারকাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৪৯৬; তাফসীরে নিশাপুরী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৪৬১; আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩৫৭; সাওয়ায়েকে মুহরেকা, পৃষ্ঠাঃ ২৫; নুরুল আবসার, পৃষ্ঠাঃ ৭৭; আল গাদীর, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৫৬ ও ১৬২; মুরাজেয়াত, পৃষ্ঠাঃ ৫৭; শাওয়াহেদুত তানযিল,

১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৬১; মানাকেবে ইবনে মাগাজেলী, পৃষ্ঠাঃ ৩১১; রুহুল মায়ানী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩২৯; ফুসুল ইবনে সাব্বাগ, পৃষ্ঠাঃ ১২৩; মাতালেবুস সউল, পৃষ্ঠাঃ৩১; তাযকেরা সিবত ইবনে জাওযী, পৃষ্ঠাঃ ৯; কেফাইয়াতুল তালিব, পৃষ্ঠাঃ ১০৬; মানাকেবে খাওয়ারেযমী, পৃষ্ঠাঃ ১৭৮; রিয়াজুন নাজরা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ২২৭; জাখাযেরুল উকবা, পৃষ্ঠাঃ ১০২; আসবাবুন নযুল, পৃষ্ঠাঃ ১৩৩) গ্রন্থস্বত্তঃ পবিত্র কুরআনে আহ্লে বাইত (আঃ), পৃষ্ঠাঃ ৫৬-৫৭)।

* কেহ আল্লাহ, তাঁহার রাসূল এবং মু'মিনদেরকে বন্ধুরুপে গ্রহণ করিলে আল্লাহ্র দলই বিজয়ী হইবে। (সুত্রঃ সূরা মায়েদা, আয়াতঃ ৫৬)। বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম, হযরত আসাদ, হযরত আলবা, হযরত ইবনে আমীন এবং হযরত ইবনে সুরিয়া যথন ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিলেন তখন রাসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করিলেন যে, আপনার পর কে দায়িত্বশীল হইবেন। আপনি বলিয়া দিলে খুব ভালো হইত। তখন রাসূল (সাঃ) ফরমাইলেন যে, আলী বিন আবি তালিব আমার পর তোমাদের অলি হইবেন। তাঁহারা বলিলেন যে, আমরা রাজি হইলাম ইসলাম আপনার নবুয়্যত ও আলীর বেলায়েতের উপর। তাহার পর আল্লাহর নিকট হইতে এই আয়াতে পাক নাযিল হইল। (সূত্রঃ শাওয়াহেদুত তানযিল, ১ খন্ড, পৃঃ ১৮৫; কেফাইয়াতুল মোওয়াহ্হেদীন, ২ খন্ড, পৃঃ ৪০৩; রওয়ানে জাভেদ, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৩৫, বয়ানুস সায়াদা, ২য় খ, পৃঃ ৯২)।

* তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং রুকু কারীদের সাথে রুকু কর। (সূরা বাকারাঃ আয়াতঃ ৪৩)।

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াত হযরত রাসূল (সাঃ) ও হযরত আলী (আঃ)-এর শানে নাযিল হইয়াছে। কারণ তাঁহারাই প্রথম ব্যক্তি যাঁহারা নামায পড়িয়াছিলেন এবং রুকু করিয়াছিলেন। অনেক সাহাবা বর্ণনা করিয়াছেন, যেমন হযরত ওমর বিন খাত্তাব, আব্দুলাহ্ বিন আব্বাস, সালমান ফারসী, আবু জার গিফারী, আনাস ইবনে মালিক, আবু সাঈদ খুদরী, আবু বুরাইদা আসলামী, জায়েদ ইবনে আরকাম, মেকদাদ বিন আমর কান্দি এবং খাব্বাব বিন আরত। তাহারা বলিয়াছেন যে, সাত বছর

হযরত আলী বিন আবি তালিব আল্লাহ্‌র রাসূলের সঙ্গে নামায পড়িয়াছেন। হযরত মোহম্মদ (সাঃ) ও হযরত আলী (আঃ) ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি তাঁহাদের সঙ্গে রুকু-সেজদা করে নাই। (সূত্রঃ মুসতাদ্‌রাক আল্‌ হাকীম, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৩৬; তারিখে বাগদাদ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৮১; ইস্তিয়া'ব, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৪৫৭; হিলিয়াতুল আওলিয়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৬৬; রিয়াজুন নাযরা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৫৮; আল গাদীর, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ২২০ ও ২৪৩; শাওয়াহেদুত তানযিল, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৮৫; মানাকেবে ইবনে শাহার আশুব, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৩)।

* সাধারণ মুফাচ্ছিরগণ- 'ওয়ারকায়ু মা আর রাকেয়ীন (২:৪৩) অর্থাৎ রুকুকারীদের সাথে রুকু কর, আয়াতের দ্বারা জামাতে নামায পড়াকে চালিয়ে দেন। অথচ এ আয়াত দ্বারা জামাতে নামায পড়ার হুকুমও বুঝায় না। কারণ নামাযে রুকুর চাইতেও সিজদার গুরুত্ব বেশী। রুকু একবার এবং সিজদা দুইবার করতে হয়। জামাতে নামায পড়া যদি আল্লাহপাক ফরজ করতেন তাহলে 'সিজদাকারীদের সাথে সিজদা কর' বলে হুকুম দিতেন বা জামাতে নামায পড়' বলে হুকুম দিতেন।

* নামাযের জামাত সম্পর্কিত নির্দেশাবলীঃ 'নামাযের হুকুম এবং তা ফরয হওয়া তো 'ওয়া আকিমুস সালাতা' শব্দের দ্বারাই বুঝা গেল। এখানে 'রাকেয়ূন' (রুকুকারীদের সাথে) দ্বারা নামায জামাতের সাথে আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ হুকুমটি কোন ধরণের? এ ব্যাপারে ওলামা ও ফকীহগনের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সাহাবা (রাঃ), তাবেয়ীন এবং ফুকাহাদের মধ্যে একদল জামাতকে ওয়াজেব বলেছেন এবং অধিকাংশ ওলামা, ফুকাহা, সাহাবা ও তাবেঈনের মতে জামাত হল সুন্নত।' এখানে সাহাবা, তাবেঈন, ফুকাহা ও ওলামাদের মধ্যেইতো মতবিরোধ তাহলে আসল কোনটি? (সূত্রঃ কোরআনুল করীম, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনুবাদীত, মদীনা পাবলিকেশান্সের পক্ষে সউদী আরবের মুদ্রিত কোরআন, পৃষ্ঠাঃ ৩৬ এর তরজমায়, এপ্রিল ২০০৪)।

* হযরত মরিয়ম (আঃ)-কে আল্লাহপাক সুরা আলে ইমরানের ৪৩ নং আয়াতে 'ওয়ারকায়ু মা আর রাকেয়ীন' অর্থাৎ রুকুকারীদের সাথে রুকু কর বলে যে হুকুম দিয়েছেন, তা কোন্‌ জামাতের হুকুম দিয়েছেন? তাছাড়া ওয়াইজা ক্বীলা

লাহুমুর কায়ু লা ইয়ারকায়ুন। অর্থাৎঃ যখন তাদের বিনত হবার জন্য বলা হয় তখন তারা বিনত হয় না (৭৭:৪৮)। এ আয়াতের অর্থ অবশ্যই এরকম হবে না যে, যখন তাদের জামাতে নামায পড়তে বলা হয় তখন তারা জামাতে নামায পড়ে না। অথচ এ আয়াতের অর্থ হবে, যাঁরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়েছে তোমরাও তাঁদের দিকে ধাবিত হও। (গ্রন্থ: আহ্‌লে কোরআন-পৃ:৬০)।

* যে ব্যক্তি জামাআতের নামাযের আহবান শুনতে পায় কিন্তু কর্ণপাত করে না তার নামায মূল্যহীন। (সূত্রঃ ওসায়িলুশ শিয়া, খন্ডঃ ৫, পৃঃ ৩৭৫)।

* হাদীস সমূহে বর্ণিত হইয়াছে, যাহারা বিনা ওযরে জামাআতে নামায পড়ে না তাহাদের নামায বাতিল। মসজিদে প্রতিবেশী যদি অব্যাহতভাবে জামাআতে হাজির না হয় তবে তাহাদের বাড়ী ঘর জ্বালাইয়া দিতে বলা হইয়াছে। (সূত্রঃ মান লা য়াহ্‌ দুরুহুল-ফাকীহ, পৃষ্ঠাঃ ৭৮)।

* জামাআত সহিত নামায আদায় করিলে ইহার সওয়াব সহস্র গুন বৃদ্ধি পাইয়া যায়, জামাআতে নামায আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কারণ। জামাআতবদ্ধ ভাবে নামায আদায়ের জ্ঞানগত, নৈতিক, ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা অগণিত।

* নিয়মিতভাবে জামাআতের নামাযে শরীক হলে মোনাফেকী এবং কপোট অভ্যাস থেকে স্থায়ীভাবে রক্ষা পাওয়া যায়। (সূত্রঃ মান লা ইয়াহ দুরুহুল ফাকীহ, খন্ড ১, পৃষ্ঠাঃ ৩৭৭)।

চাশতের নামায প্রসঙ্গে

* মুজাহিদ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি এবং উরওয়া ইবনে যুবায়ের মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম আবদুল্লাহ ইবনে উমর আয়েশার কামরার পাশে বসে আছেন আর লোকজন মসজিদের মধ্যে চাশতের নামায আদায় করছে। আমরা তাকে লোকদের এই নামায সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন (এ ধরনের নামায) বেদাআত। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ২য় খন্ড, হাদীসঃ ১৬৪৯, পৃষ্ঠাঃ ১৬৬)।

ইমামদের শাফাআত প্রসঙ্গে

* আমরা বিশ্বাস করিঃ সমস্ত নবী-রাসূলগন ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সুপারিশ করার মর্যাদার অধিকারী। বিশেষ একটা শ্রেনীর লোকদের জন্যে তাঁরা মহান আল্লাহ্‌র দরবারে শাফাআত করবেন, কিন্তু সেটা মহান আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে। (সূত্রঃ ইমামিয়্যাহ্‌ শীয়াদের আকিদা-বিশ্বাস, পৃঃ ৩৫)।

* আকাশ মন্ডলে কতনা ফেরেশতা রহিয়াছে। তাহাদের শাফাআত কোন কাজেই আসিতে পারেনা যতক্ষন না আল্লাহ্‌ তাআলা এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে উহার অনুমতি দিবেন, যাহার জন্য তিনি কোন আবেদন শুনিতে ইচ্ছা করিবেন এবং তাহা পছন্দ করিবেন। (সুত্রঃ আল কোরআন, সূরা নাজম, আয়াতঃ ২৬)।

* রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন- (লাই সামেন উম্মাতি মানিসতা খাফফাবিস সালাতিহি) অর্থাৎ- যে নামায কে সময়মত আদায় না করে সে আমার উম্মত থেতে খারিজ হবে। (সূত্রঃ বিহারুল আনওয়ার, ৭৯তম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৩৬)

* হযরত আলী (আঃ) বলেছেন - (লা য়ানালো বেলায়াতোনা মানিসতা খাফফাবিস সালাতিহি) অর্থাৎ- যে নামাযকে সময়মত আদায় না করে সে আমার বেলায়েত থেকে মাহারূব হয়, খারিজ ও বের হয়ে যায়।

* ইমাম হুসায়েন (আঃ) বলেছেন- (লা য়ানালো সাফায়াতোনা মানিস তা খাফফাবিস সালাতিহি) অর্থাৎ- যে সময়মত নামাযকে না পড়ে সে আমার সাফায়াত থেকে মাহরূব আছে সে আমার সাফায়াত পাবেনা।

* ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বলেছেন- যে জেনেশুনে নামায না পড়ে সে কাফেরের সমতুল্য। আহলেবায়েত (আঃ) হইতে বর্ণিতঃ ‘লা য়ানালো সাফায়াতোনা মানিসতা খাফফাবিস সালাতিহি’ অর্থাৎ- নিশ্চয়ই যারা নামাযকে

হালকা ভাবে নেয় তারা আমাদের সুপারিশ (সাফায়াত) প্রাপ্ত হবে না। (সূত্রঃ বিহারুল আনওয়ার ৪৭ তম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ২)

* কোরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছেঃ যখন (ইসরাফীলের) শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে তখন আর তাদের মধ্যে কোন পারস্পরিক সম্পর্ক থাকবে না। (সুত্রঃ আল কোরআন, সূরা আল্ মু'মিনুন, আয়াতঃ ১০১)।

* তাই নেক আমল না থাকলে হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সাথে তোমার সম্পর্ক তোমার কোন কাজে আসবে না। এবং রাসূল (সাঃ)-এর আওলাদের (আহলেবায়েত) উপর যে জুলুম অত্যাচার করবে সে রাসূলের (সাঃ) শাফাআত পাবে না। (বেহলুল দানা)

পাঁচ ওয়াক্ত নামায নির্ধারণ প্রসঙ্গে

* মেহরাজের রাত্রে নাকি আল্লাহপাক উম্মতের জন্য তাঁর প্রিয় হাবীব (সাঃ) এর উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছিলেন। ফেরার পথে পথিমধ্যে হযরত মূসা (আঃ) এর সাথে প্রিয়নবী (সাঃ) এর সাক্ষাৎ। হযরত মুসা (আঃ) পঞ্চাশ ওয়াক্তের কথা শুনে প্রিয়নবী (সাঃ)কে পরামর্শ দিলেন, এত দীর্ঘ এবাদাত আপনার উম্মত পালন করতে পারবে না; সুতরাং আপনি পুনরায় গিয়ে তা কমিয়ে আনেন। মুসা (আঃ) এর পরামর্শে হুজুর (সাঃ) এর যেন টনক নড়ল। উম্মতের কষ্ট হবে ভেবে তিনি পুনরায় গেলেন আল্লাহর কাছে। আল্লাহর কাছে গিয়ে আরো কিছু কমালেন। ফেরার পথে পুনরায় মুসা (আঃ)এর সাথে দেখা। মুসা (আঃ)এর পুনঃ পরামর্শ 'হে মুহাম্মদ (সাঃ); আপনি যা কমিয়ে এনেছেন তাও আপনার উম্মত পালন করতে পারবেনা; সুতরাং পুনরায় যান। আবার গেলেন, আবার কমালেন, আবার পরমর্শ, আবার গেলেন। এভাবে পাঁচবার উঠানামা করে কমাতে কমাতে পাঁচ ওয়াক্তে যখন নিয়ে আসলেন তখন মুসা (আঃ) বললেন, 'এ পাঁচ ওয়াক্তও তো আপনার উম্মত পালন করতে পারবেনা।' সুতরাং আপনি পুনরায় যান।' প্রিয়নবী (সাঃ) বললেন, 'এ পাঁচ ওয়াক্ততো আমিই আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছি। সুতরাং পুনরায় আল্লাহর নিকট চাইতে আমার লজ্জা করছে। (সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী,

আধুনিক প্রকাশনী, ৩য় খন্ড, হাদীসঃ ২৯৬৭, পৃষ্ঠাঃ ২৭২)। গ্রন্থস্বত্তঃ আহলে কোরআন, সৈয়দ গোলাম আযম, পৃষ্ঠাঃ ৫০)।

* হাদীসের নামে অদ্ভুত কিচ্ছা কাহিনী আমাদের ধর্মীয় শাস্ত্রে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রিয়নবী (সাঃ) নিজেই জানেন না যে, তাঁর উম্মতের জন্য কত ওয়াক্ত নামায আল্লাহর কাছ থেকে মঞ্জুর করাতে হবে? মুসা (আঃ) এর পরামর্শে বার বার তিনি আল্লাহর দরবারে ছুটেছেন, বার বার বুদ্ধি নিতে হয়েছে মুসা (আঃ) থেকে! এখানে জ্ঞান এবং বুদ্ধির ক্ষেত্রে প্রিয়নবী (সাঃ) কে মুসা (আঃ) থেকে খাট করা হয়েছে। অথচ হাদিস শরীফে আমরা জানতে পারি যে, হযরত ওমর যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে তাওরাত পাঠ করছিলেন তখন প্রিয়নবী (সাঃ) তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন এবং বললেন, যদি মুসা (আঃ) এ জমানায় থাকতো তাহলে তিনিও আমাকে অনুসরণ করে চলতেন। এ যেন প্রিয়নবী (সাঃ) এর প্রতি এক জঘন্য অবমাননা! আবার তাঁকেই বলা হয় 'সৈয়্যাদুল মুরসালিন' সমগ্র নবীদের সর্দার, 'রহমাতুল্লিল আলামীন' যাঁকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ কিছুই সৃষ্টি করতেন না, ইত্যাদি।

* এ হাদিসটি যদি সহি হিসেবে ধরে নেওয়া হয় তাহলে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা হলঃ তফসিরকারকদের মতে শবে ক্বদরে পবিত্র কোরআন 'লাওহে মাহফুজ থেকে একসাথে একদফায় পৃথিবীতে প্রথম আসমানে অবর্তীর্ণ হয়েছে, যা তেইশ বৎসরের নবুয়তী জীবনে প্রিয়নবী (সাঃ) এর উপর ক্রমান্বয়ে নাযিল হয়েছে। আল্লাহপাক যদি উম্মতে মুহাম্মদী (সাঃ) এর জন্য পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযই নির্ধারিত করে থাকেন তাহলে তো তা 'কিতাবুন মকনুন' তথা গোপন কিতাবে লাওহে মাহফুজে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় লিখে থাকার কথা ছিল। ঐ কিতাব বা কোরআন শবে ক্বদরে প্রথম আসমানে নেমে এসেছে (তাদের ভাষ্যানুযায়ী) এবং তা যদি হয়, তাহলে অবশ্যই ঐ নেমে আসা কোরআনে তো পঞ্চাশ ওয়াক্তের উল্লেখই থাকার কথা! (কারণ কোরআন প্রথমে আসমানে নেমে আসার অনেক পরে নবীজী (সাঃ) এর মেহরাজ সংঘটিত হয়) তাহলে আল্লাহর পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পবিত্র কোরআনে 'পঞ্চাশ ওয়াক্ত' লিখিত স্থানে 'দুলুকিস শামসি--গাসাকিল লাইলি' তথা তাদের ভাষায় পাঁচ ওয়াক্ত হল কিভাবে? পবিত্র কোরআন কি যেভাবে নেমে এসেছিল, সেভাবে পুনরায় উঠে গিয়ে তা সংশোধন করিয়ে এনেছে? না কি আল্লাহতালা কুদরতের হাতে প্রথম আসমানেই তা সংশোধন করিয়ে দিয়েছেন?

কিছু উপদেশ বাণী

* ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) বলেছেন- আলাহ্র পরিচয় লাভ করা যত সহজ নিজেকে চিনিয়া লওয়া তত সহজ নয়।

* মহানবী (সাঃ) বলেন: মনোযোগের সাথে দুই রাকাত নামায পড়া, উদাসীনভাবে সারা রাত জাগ্রত থাকার চেয়ে উত্তম। (সূত্রঃ বিহারুল আনোয়ার, খন্ড ৮৪, পৃষ্ঠাঃ ২৫৯)।

* ইমাম সাদিক (আঃ)-এর থেকে চমৎকার একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছেঃ কেউ যখন জানতে চায় তার নামায কবুল হয়েছে কি হয়নি তখন সে যেন লক্ষ করে তার নামায তাকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রেখেছে কি-না? যতটুকু পরিমাণে তার নামায তাকে অসঙ্গত কাজ থেকে বিরত রেখেছে ততটুকু পরিমাণে তার নামায গ্রহণীয় হয়েছে।

* যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পরিত্যাগ করে সে ইসলামের সীমানা অতিক্রম করে কুফরীতে পতিত হয়। (সূত্রঃ মাহাজ্জাতুল বাইদা, খন্ড ১, পৃষ্ঠাঃ ৩০১)।

* রাসূলে খোদা (সাঃ) বলেছেন, জামাতের সাথে এক রাকাত নামায পড়া, ৪০ বছর একা একা ঘরে নামায পড়ার সওয়াব। (সূত্রঃ মুসতাদারাক-উল-ওয়াসাইল, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৪৪৬)।

* শেখ সাদী (রাহঃ) হতে বর্ণিত- বে-নামাযী ব্যক্তিকে ঋন দিও না । কারন যে ব্যক্তি আল্লাহর হক পূরণ করার বিষয়ে কোন পরওয়া করে না, সে তোমার ঋনের পরওয়া করবে কেন?

* শয়তানগুলো নামায থেকে ভয় পায়, মসজিদ থেকে ভয় পায়। (সূত্রঃ সহীফায়ে নূর, খন্ড-১২, পৃষ্ঠাঃ ১৪৮-১৪৯)।

* যে ব্যক্তি নামাযকে উপেক্ষা করে আল্লাহ তার আয়ু ও মাল সম্পদ থেকে কর্তন করে নেন, তার কর্মের প্রতিদান বিনষ্ট করে দেন, তার দোয়াসমূহ কবুল হয়

না, মৃত্যুর সময়ে ক্ষুধা তৃষ্ণা ও লাঞ্ছনার অনুভূতি নিয়ে দুনিয়া ত্যাগ করে, বারযাখে শাস্তি ও আযাবের সম্মুখীন হয় আর কিয়ামতে তার হিসাব নিকাশ কঠিন হয়। (সূত্রঃ ওসায়িলুশ শিয়া, খন্ড-২, পৃঃ ৪৩)।

* কোন ব্যাক্তি নিজের আমল সমূহের কারনেই বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবেনা, যদি না আল্লাহর নিজের রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দেন। (সূত্রঃ বোখারী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১০)।

* তুমি কি মনে কর যে, উহাদের অধিকাংশ শুনে ও বুঝে? উহারা তো পশুর মতই; বরং উহারা অধিক পথভ্রষ্ট! (সূরা ফুরকান, আয়াতঃ ৪৪, পারাঃ ২৫)

* যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নাই উহার অনুসরণ করিও না, কর্ণ, চক্ষু, হৃদয়- উহাদের প্রত্যেকটি সম্পর্কেই কৈফিয়ত তলব করা হইবে। (সূরাঃ বণি ইসরাঈল, আয়াতঃ ৩৬)।

* নিদর্শনবলী ও ভীতি প্রদর্শনকারী অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের কোন কাজে লাগে না। (সূরাঃ ইউনুস, আয়াতঃ ১০)।

* আল্লাহ বলেন, ‘হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহ্‌র জন্য ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর, যদি তোমাদের নিজের পিতা মাতা অথবা নিকটআত্নীয়দের বিরুদ্ধেও হয়; সে বিত্তবান হউক অথবা বিত্তহীন হউক আল্লাহ উভয়েরেই ঘণিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করিতে প্রবৃত্তির অনুগামী হইও না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটাইয়া যাও তবে তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তো তাহার সম্যক খবর রাখেন’। (সূরাঃ নিসা, আয়াতঃ ১৩৫)।

* নামায মানুষকে অশ্লীল ও অসঙ্গত কাজ থেকে বিরত রাখে। (সূত্রঃ আল কোরআন, সূরা আন্ কাবুত- আয়াতঃ ৪৫)।

* তোমরা জনগনকে ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে বল, কিন্তু নিজেদের কথা ভুলে যাও? অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর, তোমাদের বুদ্ধিকে কি কোন কাজে লাগাও না? (আল কোরআন, সূরাঃ বাকারাঃ আয়াতঃ ৪৪)।

* হে ঈমানদারগন! তোমরা কেন সেই কথা বল যা কার্যত করনা। তোমরা এমন কথা বল যা কর না, আল্লাহ্র কাছে এটা অত্যন্ত আপত্তিকর ব্যাপার। (সূরাঃ আস্ সাফঃ ২-৩)।

* আরো এরশাদ হচ্ছে, (পৃথিবীর বেশির ভাগ) মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু তারা নয় যারা ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ এবং পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্য্যের প্রতি অনুপ্রাণিত করে। (সূরা আছর, আয়াতঃ ২-৩)

* তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল অবশ্যই থাকবে যারা কল্যানের দিকে ডাকবে। ন্যায় ও সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এ কাজ করবে তারাই কৃতকার্য হইবে। (সুরাঃ আল ইমরান, আয়াতঃ ১০৪)।

* এদেরকে জিজ্ঞেস কর, যে জানে এবং যে জানে না এরা উভয়ে কি কখনও সমান হতে পারে? বুদ্ধি বিবেক সম্পন্ন লোকেরাই তো উপদেশ গ্রহন করে। (সূরাঃ আয যুমারঃ ৯)।

* হে মুমিনগন আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। (সূরাঃ আহযাব. আয়াতঃ ৭০)।

* তোমরা কল্যানকর কাজ কর, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে। (সূরাঃ আল হাজ্জঃ আয়াতঃ ৭৭)।

* আর আমার ইবাদত কর, ইহাই সরল পথ। (সূত্রঃ আল কোরআন, সূরা ইয়াসীন, আয়াতঃ ৬১)।

******** সমাপ্ত ********

AwliyaLink
- For the Seekers of Truth !!!
www.ahlulbaytbanglabooks.wordpress.com
E-mail: awliya1214@gmail.com
★★★★★★★★★★★★★★